



Srikrishna College, Bagula, Nadia
(Affiliated to the University of Kalyani)

SRIISTI

WALL - E - MAGAZINE
FIRST ISSUE 2021



Published by Department of Physics

সূচীপত্র / Contents

Message from the Principal *Page 3

From HOD's Desk *Page 4

Anniversary Tribute *Page 5

| প্রবন্ধ / Article |

উচ্চতর শিক্ষা বনাম চাকরির পড়া অন্তু বিশ্বাস *Page 6

Talent is on the verge of destruction today Aishani Chakraborty, Soumyadip Mitra *Page 8

Online classes during lockdown Rahul Mandal *Page 10

| গল্প / Story |

জেনারেশন অন্তু বিশ্বাস *Page 11

শত্রু কপিল দেব বিশ্বাস *Page 14

সত্যিই কি স্বপ্ন ছিল সুমন সাঁধুখা *Page 19

মহাপাপিষ্ঠ সুমন সাঁধুখা *Page 24

উড়ন্ত মানব সুপ্রতীক অধিকারী *Page 31

| Infopic |

Dr. Sujay Pal *Page 35

| কবিতা / Poem |

আমারও নিজস্ব ভূমি আছে অন্তু বিশ্বাস *Page 36

Unemployment Sayan Karmakar *Page 36

সৃষ্টি সায়ন কর্মকার *Page 37

সাম্প্রতিক শ্রেয়সী বিশ্বাস *Page 38

নব-বরষা সুপ্রতীক অধিকারী *Page 38

অনুযোগ শ্রেয়সী বিশ্বাস *Page 39

সমাজচ্যুত বৃক্ষ সুমন সাঁধুখা *Page 39

স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা সুস্মিতা রায় *Page 40

Because it's life Bidisha Sarkar *Page 40





| Science Articles / News |

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের হাল হকিকত, ডা: তুষার কান্তি বোস *Page 41









Hidden Side of Thunderstorm and Lightning Dr. Sujay Pal *Page 42

Big Data and Our Daily Life Dr. Ankita Indra *Page 45











| Drawings / Paintings |

-  Savior of Mother India, Paromita Barman *Page 7
-  The Old Man, Soumik Dalal *Page 9
-  Alpona, Didhiti Raha *Page 23
-  3D Paintings, Supratick Adhikary *Page 30, 44

| Sketch |

-  Partha Biswas *Page 36, 40, 50
-  Supratick Adhikary *Page 52
-  Soumik Dalal *Page 49
-  Soumyadip Mitra *Page 50
-  Suman Sadhukhan *Page 50
-  Tarak Biswas *Page 50
-  Pabitra Sarkar *Page 51
-  Ankita Das *Page 52

| Photography |

-  Twilight, Supratick Adhikary *Page 53
-  Ray of Peace, Dr. Ankita Indra *Page 53
-  Serenity of Golden Hour, Dr. Ankita Indra *Page 54
-  Bubbles of Joy, Dr. Ankita Indra *Page 54
-  A Moment of Saffron & Gold, Dr. Ankita Indra *Page 55
-  Soumik Dalal *Page 55, 56;  Indrajeet Sikder *Page 57
-  Tripanjana Ghosh *Page 56, 57
-  Ankita Das *Page 58, 59
-  The Real Fighters, Dr. Sujay Pal *Page 60

| Miscellaneous Activities of Department of Physics 2020-21 | *Page 61

A Student-Teacher Initiative

Published by Department of Physics, Srikrishna College, Bagula, Nadia

Cover Design: Supratick Adhikary

Compiled by: Dr. Sujay Pal, Supratick Adhikary

Proof Correction: Dr. Ankita Indra

Message from the Principal

"The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled." Said Plutarch.

'Sristi' our E-Magazine of Physics Department kindles the imagination of our learners. Cradled in the lap of nature on the one hand and archaeological edifice on the other, swaying from serious thinking to playful inventiveness, almost two hundred students of Physics Department at Srikrishna College are brimming with a zeal for life empowering themselves with skills and creativity.

I congratulate all the students and faculties of Physics Department who used various mediums of expression to present their ideas. As long as our ideas are expressed and thoughts kindled, we can be sure of learning, as everything begins with an idea. I appreciate every student who shared the joy of participation in co-curricular and extracurricular activities along with their commitment to curriculum. That little extra we do, is the icing on the cake.

'Do more than belong - participate. Do more than care - help. Do more than believe - practice. Do more than be fair - be kind. Do more than forgive - forget. Do more than dream - work.' Just as our mother earth gives us more and more, 'Sristi' will enable our learners to give and get a little more of learning.

Happy Reading!

Dr. Sukdeb Ghosh
Principal

From HOD's Desk

Nurturing creativity and inspiring innovation are two of the key elements of a successful education, and a college magazine is the perfect amalgamation of both. From this point of view, the Department of Physics has taken initiative to publish a wall magazine 'SRISTI' every year.

I am pleased to announce that this year we are publishing 'SRISTI' as a wall e-magazine on our College website. True to its name, this e-magazine delivers an insight into the range and scope of the imagination and creativity of our students and faculty members.

I heartily congratulate all the students and the faculty members of this department for their tireless efforts and contributions that have come to completion in the form of this magazine. I wish it all success and hope that this tradition that has been set by the current year's efforts will be carried through by all of us in the upcoming years.

Dr. Ankita Indra
Department of Physics

Anniversary Tribute (2021)

Hermann von Helmholtz, 200th Birthday

Born in Potsdam (in the kingdom of Prussia) in 1821, Helmholtz was one of the 19th century's most versatile scientists having significant contribution in multiple scientific fields and specialties. In physics, he is known for his theories on the conservation of energy, work on Maxwell's theory of electromagnetism, chemical thermodynamics and meteorology. Some of his notable doctoral students who won the Nobel Prize are Max Planck, Heinrich Hertz, Gabriel Lippmann.



Ernest Rutherford, 150th Birthday

Born in New Zealand in 1871, Rutherford attended the University of Cambridge and soon became the world's premier experimental physicist. His early work at McGill University in Montreal established the basic principles of the newly discovered phenomenon of radioactivity. In 1911, at the University of Manchester in England, he deduced the existence of the atomic nucleus in analyzing results of experiments by his assistants Hans Geiger and Ernest Marsden. It was one of the most astounding and significant insights into the ultimate architecture of microscopic nature since the Greeks proposed the idea of atoms. He is best known for **discovery of alpha and beta radioactivity, Discovery of atomic nucleus (Rutherford model)**. When he died in 1937, the great atomic physicist Niels Bohr, who had studied under Rutherford at Manchester, remarked that, like Galileo, Rutherford had "left science in quite a different state from that in which he found it." Some of his notable doctoral students are Edward Appleton, James Chadwick, Daulat Singh Kothari, Cecil Powell.



উচ্চতর শিক্ষা বনাম চাকরির পড়া

অন্তু বিশ্বাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

গবেষণায় নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। অনেক অজানা কিছু আমাদের সামনে আসে। আর এটা করে থাকে আমাদের মতো মানুষেরাই। সুতরাং আমরাও সঠিক পথে এগোলে জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারবো। আর এই পথটার নামই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তবে বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান তার সূচনালগ্ন থেকে হাটি হাটি পা পা করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বেড়েছে অনেক। দিন দিন তা আরো বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। সাধারণ ভাবে কৃত অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা। আলো কী? গাছের পাতা কেন সবুজ হয়? কিংবা সূর্য কেন আমাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে অস্ত যায়?

এমন সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের জানা। এক সময় এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে চিন্তাশীল মানুষদের নানা নিয়ম বা সূত্রের কথা ভাবতে হয়েছে। মূলত, সেই সব নিয়ম বা সূত্রের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে বিজ্ঞান। এগিয়েছি আমরা। তাহলে কি বর্তমানে জানার জন্য কোনো প্রশ্ন নেই—আছে। তবে সেই প্রশ্ন বুঝতে গেলে আমাদের তার পূর্বের অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। খানিকটা এই জন্য, গবেষণা বলতে আমরা যা বুঝি, আমাদের একাডেমিক শিক্ষায় তার অবস্থান একেবারে উপরে।

আসলে আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে এই যে এতো চিংকার চেষ্টামেচি করি, তার আসল হচ্ছে এই গবেষণা। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানসিকতা অর্জন বলতে একটা কথা আছে। যাইহোক, ও ব্যাপারটাতে পরে আসা যাবে। এখানে আমার বক্তব্য হল, গবেষণা যে শুধু মৌলিক বিজ্ঞানেই হয় তা কিন্তু নয়। সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং জ্ঞানের অন্য সব শাখাতেই গবেষণা আছে। এবং এই গবেষণায় সেই বিষয়ের অগ্রগতির একমাত্র পথ।

সুধী পাঠকবৃন্দ, এতক্ষণের আলোচনায় একটা বিষয় নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম, কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ বা সেই জ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে অগ্রগতির হাতিয়ার করতে গেলে আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে। আমরা আমাদের সমাজের কথা ভাবি আর দেশের কথা ভাবি কিংবা নিছক বিজ্ঞানের কথা ভাবি। মৌলিক জ্ঞানচর্চা অবশ্যই দরকারি এবং অত্যন্ত দরকারি। এইটা বুঝবার আগে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমাদের মাথায় এসে থাকবে, সেই গবেষণার ঘাটে আমাদের তরী কতটা ভিড়েছে? তার অবস্থা? অর্থাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে আমাদের মনোযোগ কতটা?

এ বিষয়ে আমার কয়েকটি অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। আমরা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই অনেকটা ঠিক করে ফেলি কে কী নিয়ে পড়বো। আমার এক বন্ধু, গণিতে যার যথেষ্ট আগ্রহ এবং সে দক্ষও। প্রথমে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে পরে ছেড়ে দিলো। এবং ছেড়ে দিলো এই জন্য নয় যে, সে গণিত বোঝে না বা তার কাছে শক্ত। তার প্রথম প্রশ্ন, অনার্স নিয়ে কী করবো? শুধু শিক্ষকতা ছাড়া আর কি করা যাবে? আমি জানি আমার আশেপাশে এই মনোভাবের অনেকেই আছে, যাদের এই মনোভাব কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা অনুসন্ধিৎসার বিষয় হলেও, আমার প্রশ্ন, প্রকৃত অর্থে মেধাবীরা যদি এই দিকে না আসে তবে কিভাবে আমরা এগোবো?

আমার পরিসর ছোট হতে পারে। তবুও এই পরিসরে আরেকটি কথা বলি, আমি দেখেছি আমার অনেক বন্ধু, যারা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য প্রাণপণে খেটে অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়। এটা ঠিক, মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হবার দরকার আছে, তাই বলে ভালো ছাত্র হলেই ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হবে এটা কীভাবে মানা যায়!

তবে বাস্তব সত্য হল, আমাদের চারিদিকে এই চলছে। ভালো ছাত্র মানেই সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বেই, মেডিকেল পরীক্ষা দেবেই। এটা নিছক, অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই না। যাইহোক, সব কিছু এর সাথে অভিযোজিত হয়ে গেছে। আসলে যদি তাদের জীবন বিজ্ঞানে বা মানুষের দেহ বা তার রোগে আগ্রহ থাকতো তাহলে তারা জুলজি নিয়ে এগোতে পারতো! যাইহোক, আমরা যে ভুল পথে হাটিছি এটা নিশ্চিত। এবং এই ভুলের মূল্য ইতিমধ্যে আমরা দিতে শুরু করেছি। চতুর্দিকে চিন্তাশূন্যদের সমাগম! আর চিন্তাশূন্যরা যে পরিবর্তন আনতে পারে না, এ দ্বিতীয়বার বলবার মতো কোনো বিষয় নয়!

তবে এখানে বলে রাখা ভালো, উচ্চতর শিক্ষা মানেই যে চিন্তাশীলতার পথে হাঁটা তাও কিন্তু নয়। সেখানেও প্রশ্ন বিমুখদের সংখ্যা বেশি। যাদের আগ্রহ নতুনত্বে নেই। প্রথাতেই বেশি।

এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে আমি এটা বোঝাতে চাইলাম, বিজ্ঞাপন কিংবা প্রথার ফাঁদে না পড়ে আমাদেরকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোনদিকে এগোবো এবং কেন এগোবো? এটা আমাদেরকে পরিস্কার করতে হবে।

এইবার আর একটা প্রশ্ন এসেই যাবে, উচ্চতর শিক্ষা শেষ করলেই যে চাকরি হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তাহলে এই উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যে পরীক্ষা দিতে পারবে, সিম্পল গ্রাজুয়েশন করলেও তো সে সেই পরীক্ষা দিতে পারবে? তাছাড়া, টাকা অর্জনই তো শেষ কথা। তা যতটা আগে পারা যায় ততটাই কি ভালো নয়। সেই জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অবশ্যই আমাদের গুরুত্বের। এই মত যে অধিকাংশের তা আমি জানি। এবং একটা চাকরী যে কতটা দরকারী তাও আমি জানি। তবে একটা বিষয় আমি জানি না, জ্ঞানচর্চাকে যদি একান্তভাবে এবং ওতোপ্রোতভাবে আর্থিক দুরবস্থার সাথে মিলিয়ে ফেলি তাহলে ভুল করা হবে। কেননা, তুমি যে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করবে তা তোমার অর্থের উপর নির্ভর করে না। তা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীই বড়োলোক হতো ছোট বেলা থেকে। সুতরাং তোমার আর্থিক স্বচ্ছলতার দোহাই দিয়ে তুমি জ্ঞানচর্চাকে কোনোভাবে ছোট করতে পারো না। কেননা, তোমার উচ্চতর জ্ঞানচর্চাও তো সমাজের জন্যে প্রয়োজন।



Savior of Mother India, Paromita Barman, 6th Semester, B.Sc. Programme

TALENT IS ON THE VERGE OF DESTRUCTION TODAY

Aishani Chakraborty, Soumyadip Mitra

1st semester, Physics(H)

In the next few decades, our nation will rise as the leader of the world with the maximum young workforce, but for this, we need some good pilots who can take us through this.

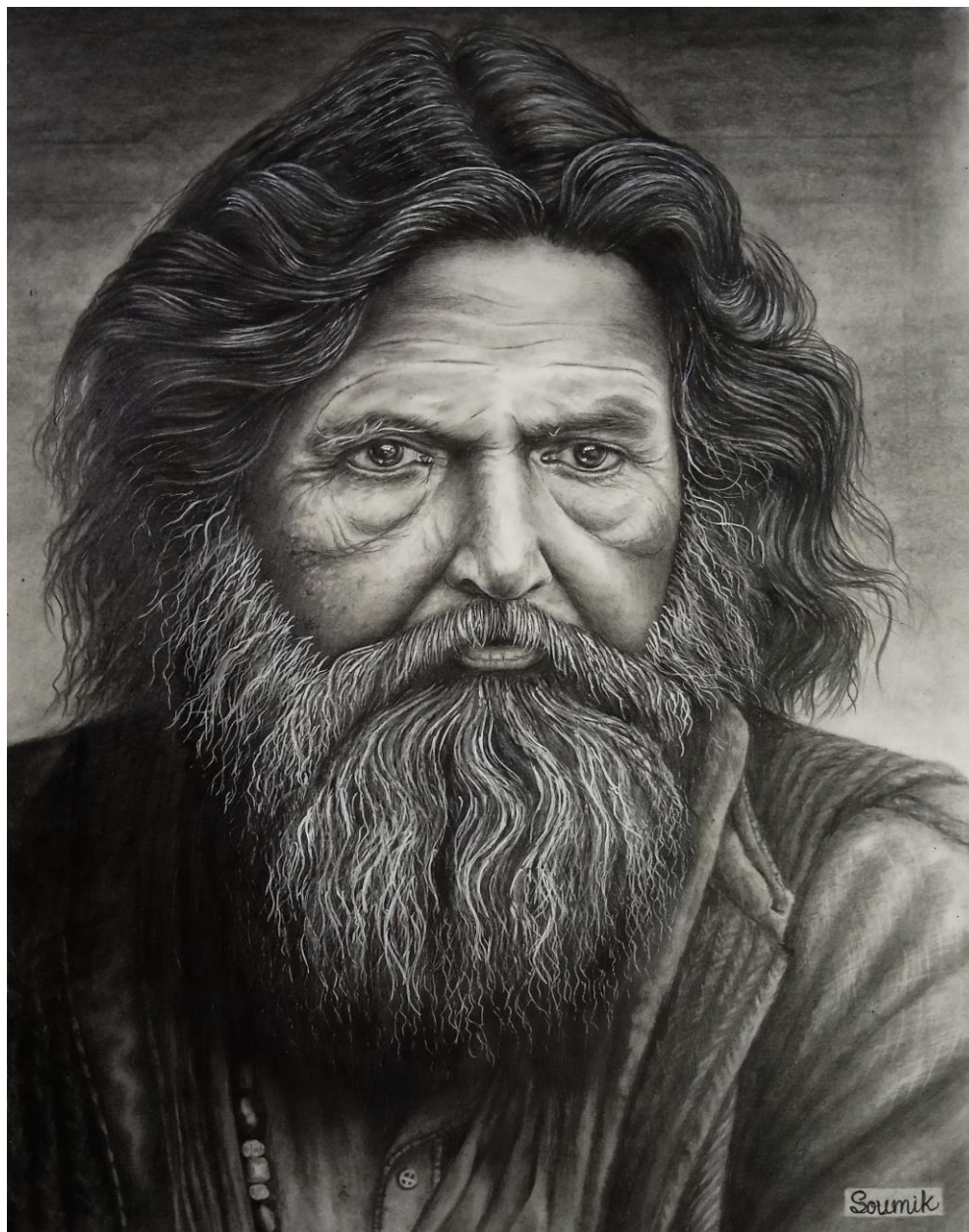
But in today's India, thousands upon thousands, millions upon millions of talents are gradually being lost. Adolescents & Youths have to sacrifice their talents for various reasons. India is the home to a large number of middle-class families. There have a lot of children & adolescents who can't express their talents due to financial problem & lack of family support in those families. Because of these, they are not able to practice their talents properly and after a time they become bore to give time behind it. Besides that, Communication and transport system of many rural areas have not improved yet. Children and youths in such areas are getting lost due to these problems. There has also some class of people in our society who do not allow many talents to develop by abusing their power & here talent is lost to power. In many cases talent is lost due to lack of proper grooming. There is a conventional word to establish oneself that is 'Biblical Teaching'. In all government and non-governmental lines, the competition has now increased due to this. So, they have to work hard in study. The future pressure is destroying their passion in lot of cases.

Such extinction of talent is affecting the society in a very bad way and it is directly harming the economy and culture of our nation. In a lot of cases, the society's backdated thoughts become a hindrance to their children's dreams, just as it their intimacy, children suffer from frustration and depression day after day. The frustrations directly harm their confidence and willpower to do something. Moreover, dirty politics and partiality are killing the talents in a horrible way. That is why the number of strikes is increasing day by day, which is sharply condemning the country's governance. Thus, our society is killing the talents from the minds of the youth and teenagers continuously. In last 15 years, 1.6 million students aged 10-27 have committed suicide in India, and 52% of them have died due to mental depression.

Only we, the youths can prevent such a loss of country's talent and in this situation of losing talent continuously, it is very important to take the first step on this as soon as possible. First of all, we need to expand our knowledge about the future directions in those lines. The second urgent step is to make a group in which the members will practice their skills with proper dedication and will have a minimum experience. Then we can go to our surrounding rural areas in small groups and raise awareness among the locals about the importance of preserving talent. We need to convince them by counseling that it is possible to make a living by following the talent if someone has the right dedication. And one thing I am ensuring you that, by overcoming all these adversities, a boy/girl will develop his/her talents, will improve more, will be an example to all and this will be the greatest victory of this war.

Our society is constantly getting polluted and it is selfish to flee our nation for fear of pollution. The nation, the society are ours, we have to make this pollution free, have to make it pure. We are the hustlers and we can do anything for our nation.

“It is not our abilities that show what we truly are, it is our choices.”



The Old Man, Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)

ONLINE CLASSES DURING LOCKDOWN

Rahul Mandal, 1st Semester, B.Sc. Programme

Online learning is one of the imminent trends in the education sector around the world. The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with distinctive rise of e-learning whereby teaching is undertaken remotely and on digital platform.

In e-learning one can study from home or any other places that is more convenient to them. It has eliminated the cost required for transportation, lodging and meals, which helped many economically weaker families, especially this year as lockdown was imposed. It has also prevented the loss of self-study. Moreover, it helps us to continue our learning maintaining social distance and being safe, which is most important in present situation.

However, besides the benefits of this method of study, it has various drawbacks too. The biggest problem is that internet connectivity is not proper in many places. So, students can't connect to their classes. Many are unable to purchase a smartphone for online classes. Another big problem is the lack of one-to-one teaching, due to it students find it very difficult to ask question if they have any doubt. Also, the overuse of electronic devices for students has resulted in various health issues. The atmosphere of face-to-face meeting is lost. It may lead to laziness and lack of discipline with students being at home.

With this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe, some are wondering how such a shift would impact on the worldwide education system. However, during the lockdown period for COVID-19, online learning is the best platform to continue the educational activities. Government of India has initiated many different online learning platforms which are also been recognized by UNESCO and World Bank. If we can resolve some obstacles related to this model, it would be a big revolution in coming years. High speed internet connection should be ensured in order to improve smooth virtual learning. Government should take proper steps to minimize the gap between privileged and unprivileged learner. And students should interact with the educators without any hesitation. Most importantly we all have to maintain the guidelines by UNICEF and WHO to get over the pandemic COVID-19.

References:

- 1) "The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how"
<https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/>
- 2) Online Learning During Lockdown Period For Covid-19 In India, Dr. Pravat Kumar Jena, Internationaljournal Of Multidisciplinary educational research, :Volume:9, Issue:5(8), May:2020.

জেনারেশন

অন্তু বিশ্বাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

১

সোনাইয়ের বাবা জেলে আছে। যখন জেলে যায়, ও তখন খুব ছোট। পাড়ার মধ্যে এক প্রকারের সবার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছে ওরা। আশে পাশের প্রায় সব গ্রামের মানুষই জেনে গেছে, সেই দিন রাত্রির বেলায় খুনটা সোনাইয়ের বাবাই করেছিল। সোনাইয়ের মা একটুও বুঝতে পারে নি। তবে এটা ঠিক মনে আছে, অনেক রাত্রে ফিরেছিল। ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকছিল। রেগে গিয়ে আশা বলেছিল, “বাচ্চাটা তো ঘুমোচ্ছে? একটু বাইরে গিয়ে খেলে কী হয়?”

পটু রেগে যায় তৎক্ষণাৎ। ওর গলা চেপে ধরে বলে, “তোকে আজকে মেরেই ফেলবো। আমার ঘরে আমি যা-ই করি তোর কী?”

আশা চুপ করে যায়। মনে মনে ভাবতে থাকে কী হয়েছে ওর। তবে খুন করবার মতো কোনো কাজ করতে পারে তা কখনোই মাথায় আসেনি আশার।

পরে এসব ঘটনা পুলিশের কাছে অনেকবার বলেছে সে। সে কিছুই লুকোই নি। যা যা সত্য সবই বলেছিল। শেষ রাত্রে দিকে পটু বলে, “আমি বের হচ্ছি। কোথায় যাবো জানি না। কেউ খুঁজতে এলে বলবে, কাল থেকেই আমি বাড়ি নেই। আমি যে বাড়ী এসছিলাম, তা কখনো বলবে না।”

কিন্তু পুলিশের কাছে কিছুই লুকোতে পারে নি সে। যদিও ভেবেছিল, কিন্তু তা পারে নি।

এই জন্যে মনে মনে আশার একটু অপরাধবোধ হয়। তার জন্যেই বোধহয় তার স্বামী আজকে জেল খাটছে! যদি সেদিন মিথ্যে কথাটুকু বলতে পারতো! তবে আশা হয়তো জানে না, পুলিশের প্রশ্নের তীর কতভাবে আসতে পারে! ওই সব প্রশ্নের উত্তর দিলেই পুলিশ বুঝে নেবে সব।

সাজা ঘোষণার দিন, বিচারকক্ষে আশা গিয়েছিল। পটুর মা, আশার শাশুড়ী ছিল। তখন সোনাই কোলে। পটুর মা সোনাইকে কোলে নিয়ে সে কী কান্না! বলে, “এর আর বাবাকে দেখা হবে না রে, আমারও বয়স হল। আজ যাই কী কাল যাই। তুই যে কেন এ কাজ করতে গেলি পটু। তোর কি ওরা শত্রু ছিল? তোকে দিয়ে যারা করালো, তারা কোথায় আজকে?”

কিন্তু আদালত কক্ষে এসব হাহাজারির খুব একটা মূল্য নেই। প্রতিদিনই এসব ঘটনা ঘটে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ দন্ডিত হচ্ছে। যেমন ডাক্তার-নার্সদের মৃত্যুর সাথে থাকতে থাকতে মৃত্যুটা এক সময় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

২

আশা কোনো কথা বলতে পারেনি সেদিন। তবে পটুর চোখে রাগের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু রাগটা কী জন্যে—এতদিন ধরে কোনো খবর নিতে না পারার জন্যে? নাকী সব সত্য বলে দিয়েছিল বলে?

পটু যখন ধরা পড়ে ওর দলের অন্যরাও ছিল। তবে তারা এক এক করে বের হয়ে গেছে। একটিবারের জন্যেও তার ফ্যামিলির কেউ খোঁজ নিতে আসে নি। এই রাগটা ওকে বিদ্ধ করছিল। আশাকে দেখার পরে, ওকেও মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল পটুর। কিন্তু হাতে তার হাতকড়া।

এই কয়দিন আশা যে বসে ছিল বা দিবিয় ছিল তা নয়। পটু এমন কিছু রেখে যাই নি যা দিয়ে দুই দিন চলা যায়। তিন তিনটে মুখে বেঁচে থাকতে গেলে কিছু তো জোটাতে হবে। আশেপাশে কেউই কাজ দেবে না। তাইই সোনাইকে ওর ঠান্মার কাছে রেখে দূর গ্রামে গিয়েছে। বেশিরভাগ দিন কোনো কাজ পায় না। কোনো দিন মাঠ থেকে শুধু শাকসবজি এনে সিদ্ধ করে খেয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। ছেলেটাকে বুকের দুধও দিতে পারে নি। একবার কান্না শুরু করলে ওকে থামানোই মুসকিল হয়। এক পর্যায়ে ওর ঠান্মাই কান্না শুরু করে দেয়। বলে, “কী করবি দাদা? তোর ভাগ্যে ছিল এই! কত খাদ্য নষ্ট হয়। আমরা তা পাই না।”

৩

কেটে গিয়েছে কয়েক বছর।

আশা সোনাইকে নিয়ে কয়েকদিন জেলের গেটে এসে ফিরে গিয়েছে। পটু গোঁ ধরে বসে আছে, সে আর কোনোদিন কারো সাথে দেখা করবে না। যাদের জন্যে সে এতো করেছে, তারা তার জন্যে একটা উকিল পর্যন্ত ধরতে পারল না। তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে কী লাভ? জেলখানার কয়েদী বন্ধুরা দুই একজন এসে বলে, “পটা দা, বৌদি গেটে দাঁড়িয়ে আছে? তোমাকে যেতে বলছে। যাও না।”

পটু যায় না। ছেলেটাকে দেখতে যে ইচ্ছে করে না তা নয়। তবে আশার 'পরে রাগ করে সে যাবে না। একদিন কী একটা খাবার যেন এক কয়েদির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সে ওই কয়েদির উপর রেগে যায়, বলে, “তোকে দালালি করতে কে বলেছে? তুই খেলে খা, না হলে দে আমার কাছে, আমি ফেলে দিই।”

বলেই ওর হাত থেকে ধরে নিয়ে যেখানে ময়লা ফেলা হয়, সেখানে পড়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে সোনাইয়ের কথা। ভাবে, সোনাই ঠিকঠাক খায় তো—কী কী রান্না করেছে তা দেখে খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে সংসার কেমন চলছে! ওই ময়লায় একটু আগে যে খাবার ফেলেছে তা একটু ছড়িয়ে পড়েছে। দেখে জেলের থেকেও খারাপ চালের ভাত, আর কী একটা তরকারি যেন।

প্রথম প্রথম পটু ভাবতো, কেনই বা সে খুনটি করল? সে তো খুন না করেও সংসার চালাতে পারতো। খুন করে দিলে যে বলেছিল অনেক টাকা দেবে, সে তো এখন দিবি্য আছে। অথচ সে-ই পড়ল বিপদে, এই ছ'বছর হল। এখনো আট বছর। আঙুল গোনে পটু, এক, দুই, তিন.....

৪

কীভাবে যেন সোনাইটা পড়া শিখে গেছে। যখন ওর ছয় বছর বয়স হয়েছিল, ওর ঠাম্মা বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা প্রাইমারি স্কুলে ওকে ভর্তি করিয়ে দিতে গিয়েছিল। ভর্তি করাতে করাতে ভাবছিল, ওর বাপ, সে এখন জেলের ভাত খাচ্ছে, ওকেও তো একদিন এই স্কুলে দিয়েছিল। এক দুই ক্লাস পড়ে আর পড়ল না। যদি একটু পড়তো তাহলে কী আজকে ও জেলে থাকতো! মনে মনে মানত করে ঠাম্মা, আমার সোনাই পড়ালেখায় ভালো হোক ঠাকুর।

সোনাই সত্যিই পড়ালেখায় ভালো হল। এক দুইবার যা পড়ে তাতেই মনে থাকে সব। স্কুলের স্যার-ম্যাডামরাও ওর প্রশংসা করে। আশা মনে মনে ভাবে, আমার যতো কষ্ট হোক আমি ছেলেটাকে মানুষ করবো। সোনাইয়ের মা বলে ইতিমধ্যে কতজনে একটু একটু খাতির করা শুরু করে দিয়েছে। তাহলে সোনাই যদি আরো বড় হয়, আরো ভালো পড়ালেখা করে তাহলে কেমন হবে?

সোনাইয়ের মাকে স্কুল থেকে কিসের জন্যে যেন ডেকেছে। সোনাইয়ের পড়ালেখার সব কিছু ওর ঠাম্মাই দেখে। তাহলে ওর মাকে হঠাৎ কেন ডাকল? সোনাই বুঝতে পারে না। তবুও বাড়ি ফিরে মাকে বলে, মা, “তোমাকে স্কুলে যেতে বলেছে দিদিমণিরা।”

আশা বলে, “তোর ঠাম্মাকে নিয়ে যা?”

সোনাই বলে, “না, তোমাকেই যেতে বলেছে।”

আশাও বুঝতে পারে না কিসের জন্যে? তাহলে কি ওর বাবার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবে?

আশার এই কয়বছরে মুখটা একবারের জন্যেও হাসে নি। এমন জীবনের স্বপ্ন সে কোনোদিন দেখে নি। সে ভাবতো, তার স্বামী তাকে খুব ভালোবাসবে। সবাইকে নিয়ে একটা সুখের পরিবার হবে তার। কিন্তু সে সবার কিছুই হয় নি। শুধুমাত্র পেটের জন্যেই তাকে এত কাজ করতে হয়েছে। কতবার মরে যাবার কথা ভেবেও সোনাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তা করতে পারে নি। এই গ্রামে সে কাউকে তার মুখ দেখাতে চায় না। তাই খুব ভোর করে বেরিয়ে যায় কাজে।

সেদিন আর কাজে গেলো না। হাজার হলেও ওর স্কুল থেকে ডেকেছে। স্কুলে গিয়েই বুঝতে পারল, তার সোনাই সবার কত প্রিয়। এক ম্যাডাম বলল, “আপনার কথা আমরা সব শুনেছি। আপনাকে একটা কাজ দিতে চাই, করবেন?”

আশা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখে কথা আটকে গেল। মাথা নাড়িয়ে বলল, “হ্যাঁ।”

ম্যাডাম বললেন, “আমাদের স্কুলের মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ।”

আশার চোখে জল চলে এলো। ম্যাডামরা সবাই বলল, “আপনি কাঁদবেন না। আপনার সোনাই সত্যিই সোনা। ও বড় হলে কোনো দুঃখই থাকবে না, আপনার। ওর পড়ালেখাটা যাতে ঠিকমতো চলে, তাই আমরা আপনাকে কাজটি দিলাম।”

৫

বাড়ি ফিরে ইচ্ছে হল, সোনাইয়ের বাপকে এই খবরটা দেওয়া দরকার। কয়দিন আগে সোনাইয়ের রেজাল্ট বেরিয়েছে, সে ফার্স্ট হয়েছে তাও জানানো হয় নি। কালকে যাবে দেখা করতে। সোনাই এখন স্কুলে যাচ্ছে। ওকে নেবে না। নিজে নিজেই যাবে। কিন্তু দেখা করবে তো? নাকি আগের মতোই থাকবে। তবুও এমন খবর দিলে নিশ্চয়, সে আসবেই।

সেদিনও প্রথমে এলো না। একজন কয়েদিকে বলল, “তোমার দাদাকে একটু ডেকে দিবে? বলবে, সোনাই ফার্স্ট হয়েছে। আর আমি স্কুলে রান্নার কাজ পেয়েছি।”

কয়েদিটা বলে, “বৌদি, দাদার তো শরীর খুব খারাপ। ডাক্তার এসে দেখে গেছে। তবুও আমি বলছি।”

উতলা মনটা মুহূর্তেই যেন চমকে গেলো।

কয়েদিটা গিয়ে বলতেই, আর স্থির থাকতে পারল না পটু। এতোদিন রাগ ছিল। জ্বরের পরে সেসব রাগ কোথায় যেন হাওয়া। সোনাই তার ক্লাসে ফার্স্ট হয়—ভাবতেই তার কত ভালো লাগছে।

শরীরে অনেক জ্বর। একটা পুরোনো ধুলোমাথা কব্বলে মোড়া শরীর। একটা বিকট দুর্গন্ধ তাতে। তাইই নিয়ে যায়, আশার সাথে দেখা করতে। টানা দুই-তিন বছর দেখা করে নি। আশা অনেকবার এসে ফিরে গেছে। শেষে এই ছয়মাস বাদে এলো।

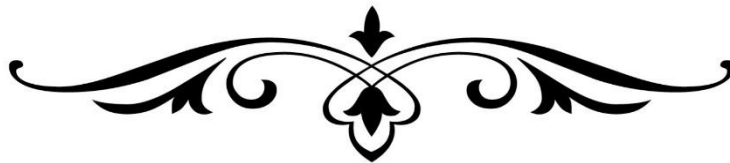
আশা পটুকে দেখেই কেঁদে ফেলে। দাড়ি অনেকদিন কাটে না। চুলগুলো এলোমেলো। মনে হচ্ছে, শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাছাড়া শরীর একেবারে ভালোও না। চোখ মুছতে মুছতে বলে, “একটু যত্ন নিও নিজের। আর সাত বছর। এর মধ্যে তোমার সোনাই অনেক বড় হবে। ওর রেজাল্ট দিয়েছে। ও ফার্স্ট হয়েছে ক্লাসে। এবার টুর থেকে থিতে গেলো।” পটুর চোখ দিয়েও জল ঝরে। বলে, “ও কত বড় হয়েছে?”

“বেশ বড় হয়েছে। একদিন নিয়ে আসবো। স্কুল থাকে তো ওর। স্কুলে আমার রান্নার কাজ হয়েছে।”

পটু কী বলবে ভেবে পায় না। একটু বাদেই সাক্ষাতের সময়সীমা ফুরোয়। ঘন্টা বেজে যায়।

পটু ওর জায়গায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ে। অনেকদিন পরে দেখলো আশাকে। ওর শরীরও ভালো নেই। সোনাইয়েরই সেই দুইবছর আগের মুখখানিও বারবার মনে পড়ছে। ওর জন্যে মনের মধ্যে কেমন আলাদা একটা অনুভূতির সুন্দর সুশীল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতি যেন একার জন্যে নয়। তাই পাশের কয়েদি লক্ষণকে ডেকে বলে, “শুনছিস ভাই। ছেলেটা আমার লেখাপড়ায় দারুণ হয়েছে। এক রোল হয়।”

এখন শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। শুধু ভাবে, কবে এখান থেকে বেরোবে সে? সবে তো সাত বছর হল! এখনো সাত বছর! ততদিনে সোনাই অনেক বড় হয়ে যাবে। হিসেব করে ওর মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বেরোতে পারবে কি না!



শত্রু

কপিল দেব বিশ্বাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

প্রায় রাত তিনটে বাজতে কিছুটা সময় বাকি। এর মধ্যে আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখতে দেখতে। আর আমি স্বপ্ন দেখলে খারাপটাই দেখি। যে স্বপ্নে শুধু মারামারি, কাটাকাটি ও হাহাকার থাকে। হবে হয়তো আমার মনের বহিঃপ্রকাশ, যে কাজগুলো আমি দিনে সহ্য করে কিছু বলি না কিন্তু রাতে স্বপ্নে সেই জায়গাতে ফিরে যাই।

ঘুমোনের চেষ্টা করেও পারি নি। প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। বেসিনে গিয়ে মুখ ধুয়ে আয়নাতে মুখ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—সত্যি এটা আমি তো? চেহারা আমার থাকলেও, আমি হারিয়েছি আমার স্বভাব, সহনশীলতা, ধৈর্য, পরিশ্রম। কিন্তু বেড়ে গিয়েছে আমার ক্ষিপ্ততা ও আমার একাকী ঘুরে বেড়াবার নেশা।

আমার আগের মতো মানুষের সাথে মেশার অভ্যাস রয়ে গিয়েছে। সেই সাথে ঘুরে বেড়াবার নেশা বেড়ে গেছে। হয়তো নিজেকে ভালো রাখা কিংবা কিছু জানা ও বোঝার জন্যে ঘুরে বেড়ানো। এই বাজে স্বভাব (অনেকের কাছে) বা প্রকৃতিই আমাকে এমন করে তুলেছে। আস্তে আস্তে আমার চেনা মানুষগুলোর ব্যবহার কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন পৃথিবীতে একা হয়ে যাচ্ছি। আমার সহযোগিতার লোকের খুব অভাব। তাই আমার সঙ্গী হচ্ছে—অরিজিৎ সিং, অনুপম রায়, শ্রেয়া ঘোষাল, রূপম ইসলামের গান।

বেসিন থেকে রুমে ফিরে মোবাইল ফোন দেখতে শুরু করলাম। ফেসবুক খুলে দেখতে দেখতে দেখলাম, আমার দুটো বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওখানে আমি বাদে অনেকেই উপস্থিত। প্রায় সবাই উপস্থিত। জানি না কিভাবে বিয়ে হয়েছে—পালিয়ে না বাড়িতে অনুষ্ঠান করে। প্রায় ছয় সাত মাস ওদের বিয়ে হয়েছে। ওদের প্রত্যেকের মোবাইল নম্বর আমার কাছে ছিলো। কিন্তু কেউ কোনো ফোন বা এসএমএস করে নি। ওদের সাথে আমার কলেজে ক্লাসে পরিচয়। তাই কয়েকটা বছর কাটানো। কিন্তু আমি ওদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ না। এর মানে এই না যে, ওরা আমার সাথে কথা বলতো না কিংবা ফোন করতো না। আড্ডাও হতো। কিন্তু এই সব করতো, যখন আমাকে কোনো কাজের জন্যে দরকার হতো, ঠিক তার কিছুদিন আগে থেকে। যখন কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম, প্রোজেক্ট বা প্রাক্টিক্যালের কাজের দরকার হতো, তখন। ওদের প্রধান কাজ ছিল নিজের কাজটা ঠিক করে নেওয়া। তাই ওদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। খারাপ লাগল, আমাদের গ্রামেই এক বান্ধবীর বাড়ি ছিলো, তাই কী করে আমি জানাতে পারলো না! না জানারও একটা কারণ আছে। আমি তো বাড়িতেই থাকি না। ঘুরে বেড়ানোর নেশায় বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। বাড়ি যাই মাঝে মধ্যে। কিন্তু বেশি দিন থাকা হয় না। আর কোনো স্থায়ী চাকরি না করায় এখানে ওখানে যেতে হয়।

দুই তিন দিন আগে আমার দীপুর সাথে দেখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। বলতে বলতে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ীর সবাই কেমন আছে?

উত্তর দেওয়ার সময় একটু চুপ থেকে বলল, ঠিক আছে!

আমি মনের সন্দেহে বলে উঠলাম, কাকু-কাকিমার কিছু হয় নি তো?

ও দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, বাবা আর নেই। সুইসাইড করেছে।

আমি আর কারণ জানতে চাইনি। তার আগে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছিলো। এটা ও দেখে বলল, চল, যা হবার তা হয়েছে। ছেড়ে দে ব্যাপারটা।

তারপর আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে হালকা করে চাপড় দিতে লাগল। চোখ মুছে বললাম, কী জন্য এটা করল?

দীপু বলল, মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। আর আমাদের পারিবারিক কারণ, অর্থনৈতিক ব্যাপার, এই সব কিছু নিয়ে ঝামেলা চলছিল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে, যার যার গন্তব্যস্থলে চলে যাই। দীপুর বাবার কথা শুনে আমার বাবা, মা ও ভাই বোনদের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল। এই দুঃখের সময় দীপুর পাশে দাঁড়াতে পারি নি। খারাপ লাগছে। কিন্তু কী করবো, আমাকে তো সঠিক সময়ে খবরগুলো দেয় না। আর আনন্দের সময় আমার কথা ভুলে যায়। আসলে সবদিন আমাকে কেউ গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই নেয় নি। হাসাতে ভালো লাগত, তাই হাসাতাম, মজার পাত্র হতাম। কিন্তু দিনশেষে মনে রাখে নি কেউ। আর রাখতেও কেউ চায় না। আমার বন্ধুগুলো—এই দুটো বান্ধবী

আর দীপুর মতো সবাই ভাবতে পারো। কিন্তু ঠিক তা নয়, আমার শত্রু আছে। যার সাথে আমার ছোটবেলা—আমার শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে। তাহলে বলাই যায় তার কথা।

আমি রিশান। আমার যে শত্রুর কথা বলতে যাচ্ছি তার নাম রণজয়। আমাদের পরিচয়টা হাইস্কুলে হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম দিন দেখেছিলাম কিন্তু কথা হয় নি। সামনের বেঞ্চে বসা এক সন্ত-শান্ত ছেলে, স্যার-ম্যাডামদের অনুগামী। আমি একটু দেরি করে যাওয়ায়, পিছনে বসেছিলাম। আমার সাথে রণজয়ের পরিচয় হয় টিফিনে মাঠে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে। তখন ক্রিকেটই আমার জীবনের সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো জড়িয়ে ছিলো। খেলতে গিয়ে আমাকে কেউ না নিলেও আমরা ছোটরা অন্য জায়গাতে খেলতে শুরু করি। আমি বল কিনতে টাকা দিয়েছিলাম আর ব্যাট বানিয়েছিলাম একটা ভাঙ্গা বেঞ্চার কাঠ দিয়ে। আমরা একই টিমে খেলছিলাম। ওর ভালো ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং আমাদের জয়ী হতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এইভাবে আমরা ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি এক সাথে খেলতাম। দুজন প্রায়ই একই সাথে থাকতাম, এমন কি পরীক্ষার জন্যে একই জায়গায় বসতাম। আমার সাথে কোনোদিন ও পরীক্ষায় পেরে ওঠে নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না এটা নিয়ে। প্রায়ই আমরা স্কুলে গিয়ে বসতাম দ্বিতীয় বেঞ্চে, আর যদি শেষে বসতাম স্যার/ম্যাডাম আমাদেরকে ডেকে সামনে বসাত। ধীরে ধীরে আমাদের চারটি বছর কেটে যায়, কোনো বাধা আসে নি। যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম তখন রণজয়ের কথাবার্তা, চলাফেরা, বন্ধুদের সঙ্গে বদলে যায়। আমার অন্য বন্ধু ছিলো না তা নয়, আরো অনেক বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে প্রতাপ, মিঠুন, শুভ আর অনুপের সাথে দেখা মেলে ক্লাস ইলেভেনে। নাইনে থাকা কালে আমরা মোবাইল ফোন কিনি দু'জনেই। একটা মিসকল মানে ঘুরতে যাওয়ার সংকেত, দুটো মিসকল মানে খেলতে যাওয়া। আর আমাদের টাইম ঠিক ছিলো কখন কী করতে হবে। তেমন কোনো এদিক ওদিক হতো না বললেই চলে। অনেক সময় রণজয় স্কুল পালিয়ে বাড়ি আসতো, আমিও একই সাথে তাল মেলাতাম।

স্কুল পালাতে গিয়ে আমাদের একদিন প্রধান শিক্ষক দেখে ফেলে। যেহেতু আমাদের চিনতো, তাই পরের দিন ডাকা হলে স্যারের রুমে। আমরা গিয়েছিলাম এবং রণ'র চালাকিতে আমাদের কিছু বলে নি। স্যারকে ও বলল, স্যার, আমার শরীর খারাপ লাগছিল। সাইকেল এনেছিলাম না। তাই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আসলে অন্য পাড়ার ছেলেদের সাথে আমাদের সেদিন ক্রিকেট ম্যাচ ছিলো। আমরা দুজনেই অন্য টিমের হয়ে মাঝে মাঝে খেলতে যেতাম। মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশনের দিন চলে আসে। এবং আমরা একই সাথে অর্থাৎ পর পর ফর্মগুলো জমা করি।

দশম শ্রেণিতে উঠে আমরা একটু অন্যরকম হয়ে গেলাম। কাউকে ইচ্ছা করে স্যারের কাছে মার খাওয়ানো, নিজেরা শব্দ করে অন্যের উপর দোষ চাপানো এমনকি বাংলা ক্লাসে স্যারকে ডিস্টার্ব করা। ইংরেজি স্যার রেগে গেলে স্যারকে বলতাম, স্যার, আপনার একটা কবিতা শোনান। আর স্যার শোনাতে শুরু করলে আমরা পিছন বেঞ্চে গিয়ে হাসতাম। একদিন রণ স্কুলে আসে নি। ওইদিন আমি পিছনের বেঞ্চে ছেড়ে মাঝের দিকে একটা বেঞ্চে বসি। কিন্তু সেদিনই স্যার বিনা কারণে পিটিয়েছিল লাঠি দিয়ে। ওই দিন ভেবেছিল 'শব্দ'টা আমি করেছি, কিন্তু ওটা আমি করি নি। ঠিক আমরা যেটা করতাম ওটাই আজ আমাদের সাথে হয়েছে।

এইভাবে দিনগুলো কাটছিল বেশ করে। কোনো অসুবিধা ছাড়া নিজের মতো। আমার এখনো মনে আছে, ইউনিট টেস্টের আগে আমাদের ক্রিকেট খেলা ছিল ১৬ দলের। সেখানে আমরা খেলতে গিয়েছিলাম। তাই পরীক্ষার আগে দুইদিন স্কুলে যাই নি। আমরা সেই খেলায় ফাইনালে উঠেছিলাম। আমাদের দলের ফিল্ডিং। শেষ বলে তিন রান লাগবে প্রতিপক্ষের। রণ বোলিং করছিল, বলটি করা মাত্রই সুইপ করেছিল এবং সেটি আকাশের হাতে গিয়েছিল। আর ও কি বুঝে যে ওভারথ্রো করেছিল জানি না। যেহেতু পিংপং বলে খেলা ছিল, তাই থ্রোটা না করলেও পারতো। তবে বলটি আমিই ধরে ম্যাচটি জিতিয়েছিলাম। জয়ের কী অসাধারণ অনুভূতি!

ম্যাচ সেরা রণই হয়েছিল। কিন্তু আমার ফিল্ডিং এর জন্যে সবাই খুশি ছিল, আমি নিজেও। আমাদের আনন্দগুলো ভাগাভাগি করেছিলাম গলায় হাত দিয়ে। এর আনন্দ একমাত্র খেলোয়াড়ই বোঝে। আমাদের প্রাইজ ছিলো দুই হাজার টাকা আর একটি ট্রফি। পরের দিন রাতে রণ'র কথায় পিকনিক হয়। আমাকে ফোন করা হলেও পরীক্ষার জন্যে যাওয়া হয় নি। পরীক্ষা দেবার জন্যে রণ আমার জন্যে পাশাপাশি জায়গা রেখে দেয়, বসব বলে, যে কথা সেই কাজ।

দুটো পরীক্ষা দেওয়ার পর স্যার বুঝে ফেলে আমাদের আর এক জায়গায় বসতে দেয় নি। তাই আলাদা বসতেই হলো। পরের ফলাফল ঘোষণার দিন আমার থেকে কমই ছিলো অনেক। একটু দুঃখ পেলেও, পরে আবার আমার সাথে মিশে যায়। কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। এইভাবে আমাদের একে একে সব ইউনিট টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়। যেহেতু আমরা আলাদা জায়গাতে প্রাইভেট পড়তাম, তাই রণ আমার কাছে প্রত্যেক দিনই পড়তে আসতো। রেজিস্ট্রেশন একই জায়গায় হওয়ায় রণ আমার খাতা একেবারে প্রত্যেকটা শব্দ মিলিয়ে লেখে। ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন ওর ওই রকম অবস্থা দেখে ম্যাডাম বলেছিল, বাবা তুমি অনেক বড় ভুল করছো। এসব করো না। এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। তোমার সাফল্য তুমি অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে।

আমি তখন কোনো কথায় কান না দিয়ে সাহায্য করি এই ভাবে। ভেবেছিলাম, স্যার ম্যাডামরা তো বলবেই। এটুকু সাহায্য করা যেতেই পারে। ইতিহাস পরীক্ষার দিন রণকে বলেছিলাম, বলে দে। মনে পড়ছে না।

রণ বলেছিল, পরে বলছি। যেটুকু পারিস। সেটুকু আগে লেখ।

এইভাবে দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও আমাকে ওই একই কথা বলা হয়। পরীক্ষা শেষ হবার সময় বলে, অনেকটা বাকি আমার। তুই যা পারিস লিখে দে। ততক্ষণে আমি যথেষ্ট লিখে ফেলেছিলাম, যাতে আমি পাশ করেও আরো বেশি পাবো। তাই আর কোনো কিছু বলি নি। বাড়ি ফেরার সময়ও একটি কথা বলি নি। পরীক্ষার ফলাফলে ওর থেকে বেশিই পাই। আমি সায়েন্স আর রণ আর্টস বিভাগে ভর্তি হওয়ায় আমাদের সম্ভ্রুটা পুরো আলাদা হতে থাকে। আমার তখন দেখা হয় অনুপমের সাথে। বিকেলে সময় পেলে আমরা খেলতাম, ঘুরতে যেতাম, আড্ডা দিতাম। গরমের ছুটির দিনগুলোতে চলতো পুরোদমে আড্ডা।

এক বিকেলে ঘুরতে গিয়ে শুনি রণ কোনো একটা মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে। তাই সেদিন বিকেলে শুভেচ্ছা জানালাম। সবাই মিলে ছোট একটি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল।

এইভাবে একাদশ শ্রেণি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষার আগে রণ বলে, ভাই, কাল তো আমাদের বাংলা পরীক্ষা। কিন্তু আমার তো বাংলা-ইংরেজি বই নেই।

সাথে সাথে ওকে বললাম, চলে আয় আমার বাড়ী। দুজন এক সাথে পড়বো। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু আমার একটি সহায়িকা বই থাকায় বিপদে পড়ে গেলাম। কিন্তু ঠিক সমাধান বের করে ফেললাম। বইটি ছুরি দিয়ে কেটে দু'ভাগ করে নিলাম। এক ভাগ আমি, ও অন্যভাগ রণো পড়ল। এইভাবে ইংরেজির দিনও পার করলাম। দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের চাপটা আরো বেশি বেড়ে যায়। তাই সবাই একটু মনোযোগ সহকারে পড়া শুরু করেছিল।

এর সাথে আমার বিকেলগুলো নেমে এলো অন্ধকারের মতো। কারো সাথে কোনো যোগাযোগ ছাড়া, কোনো আড্ডা ছাড়া ও হাসিহীন বিকেল। অনেক সময় অনেক বিকাল আমার একা থাকতে হয়েছে। আস্তে আস্তে কেমন যেন দূরত্বটা বাড়তে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত কখনও দেখা হলে দুই একটা কথা বলতো আর তাছাড়া অন্যান্য কাছে খুব ব্যস্ত। বন্ধু বলতে তেমন কোনো মানুষের সাথে তেমন কোনো যোগাযোগই রাখতো না নিজের দরকার ছাড়া। পরীক্ষা হলে পরীক্ষা সবাই কেমন দিয়েছে বলাবলি করছিলাম, তখন ও পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ভাই ফাটিয়ে দিয়েছি।

পরীক্ষার পর ওরা ঘুরে বেড়ালেও আমার যাওয়া হল না। কেননা আমার এনট্রান্স পরীক্ষা ছিল। ইতিমধ্যে রণ কোথা থেকে শুনেছে, পলিটেকনিকের কথা। ওকে আমিও বলি, তুই দিতে পারিস এটা, কোনো ব্যাপার না, শুধু মাধ্যমিক পাশ থাকলেই হবে। তাই আমাকে রীতিমতো জোর করা হল ওর সাথে ফর্ম ফিল আপ করতে। যাতে পর পর এক জায়গাতে বসতে পারা যায়। দীপ দাদা আমাদের রাত দু'টোর দিকে ফর্ম ফিল আপ করে দিয়েছিল। পরীক্ষার প্রশ্ন গুলো আলাদা সেটে পড়ে, তাই আগে সারা রাত ধরে ভাবছিলাম, কীভাবে ওকে হেল্প করবো। তারপর ঠিক বের করে নিলাম উপায়। পরীক্ষা দেবার সময় স্যার বলল, তোমাদের প্রশ্ন গুলো কি এক? এই ছেলেরা তোমারটা দেখে লিখছে? কে শোনে কার কথা। আমি তো ওকে দেখানোর জন্যেই এসেছি। পরীক্ষাটার দুটো ভাগ ছিল। প্রথম অর্ধের পর আমি টিফিনির খাবার কিনেছিলাম এবং ভাড়া দিয়ে ওকে নিয়ে এসেছিলাম। ও বলল, যদি হয়ে যায়, তাহলে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আমি বলেছিলাম, যা পরীক্ষা হয়েছে, হয়ে যাবে। এখনই খাওয়া দাওয়া টা দিয়ে দে। বিশ্বাস হয় নি বলে বলে, দেখা যাক কী হয়। এর কিছুদিন পরে রণ আমাকে বলল যে, এক হাজার টাকা লাগবে, একটা কাজ আছে। আমি দিয়েছিলাম এবং কিছুদিন পরে দেখলাম, আরো কয়েকজনকে নিয়ে ও দীঘাতে ঘুরতে গিয়েছে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল অনুভব করছিলাম, একবার আমাকে বললে, আমি যেতাম তোদের সাথে ঘুরতাম। কিন্তু এই

ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনো কোনো কিছু বলি নি শুধু মনেই রেখেছি। ফলাফল প্রকাশের পর আমি পলিটেকনিকে গেলাম না, কিন্তু রণ গেলো। মোটামুটি ভালোই র‍্যাঙ্ক এসছিল। কাউন্সিলিং করতে দীপ দাদাদের বাড়ি যাওয়ার পথে আমাদের এক্সিডেন্ট ঘটে, তাতে আমার সামান্য পা কেটে যায় এবং বুকের হাড়ে ব্যথা পাই। ওইদিনই কাউন্সিলিং করি এবং খুব ভালো কলেজে ভর্তি হয়। তারপর আমাকে ফোন করে বা দেখা করে বলে আমি এসব পারছি না, ছেড়ে দেবো। কিন্তু আমি বুঝিয়ে বলতাম, ছাড়িস না। একদিন এসে আমার সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরটা নিয়ে যায় দশ দিনের জন্যে। তারপর আমার সাথে দরকার না হলে আর কোনো কথা হয় না। শূন্যতা গ্রাস করে আমাকে। কারো সাথে তেমন দেখা হয় না। তাছাড়া এন্ট্রাস পরীক্ষায় ভালো র‍্যাঙ্ক না আসায় তেমন কোনো ভালো কলেজ মেলে নি। ইঞ্জিনিয়ারিং এ হলেও যেতে দেয় নি মা।

এ সময়ে বাড়ি থেকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ উৎসাহ দিতো না। আর প্রয়োজন ছাড়া কেউ কথাও বলতো না। আমার থেকে ছোট ছোট মানুষগুলো সবাই আমাকে দেখে ব্যঙ্গ করতো যে আমি পারি নি কাজটি করতে। তাই নিজেকে সব সময় চারটি দেওয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখতাম। বন্ধুরা কেউ ডাক দিলে দৌড় দিয়ে চলে যেমন একটু আনন্দের জন্যে। এমনই একদিন বৃষ্টির পর বিকেলে বের হয়েছিলাম, শুনলাম, রণ মেয়েটির সাথে সম্পর্কটি ছেড়ে দিয়েছে কোনো কারণ ছাড়াই। আর মেয়েটি আমাকে দেখলে 'দাদা' বলে ডাকতো। তাই আমি রণর কাছে শুনি, কেন এমন করেছিস? কারণটা কি? তোর মতো মানসিকতার জন্য অন্য কেউ ভুগবে আগে থেকে জানা ছিল না। আরো অনেক তর্কাতর্কি হয়, জানি না কেন আমার মনে দাদার দায়িত্ব-কর্তব্য বোধটা চলে আসল। রণর উত্তর ছিল, হ্যাঁ আমি সবাইকে খারাপ করেছি, তাই না?

ওই কথা বলার পরে পুরোটা বিকেল আমি কারো সাথে কথা বলি নি। কিছুদিন পরে ওর বাড়িতে জন্মদিন পালন হচ্ছিল। আমি জানি না। রাতে তিন চারজন আমাকে ফোন করে বলে, যাবি না ওর বাড়িতে অনুষ্ঠান। আমি বলি, দেখছি। রণ কিন্তু কিছুই বলে নি আমাকে এটা নিয়ে। তাই ওর বাড়িতে গিয়ে সবাই আমাকে ফোন করে কিন্তু আমি আর ফোন ধরি নি। পরে একদিন আমাকে অন্য নম্বর থেকে ফোন করে অনেকবার ভুল স্বীকার করে। কিন্তু আমি তেমন কোনো সাড়া দিই নি। আসলে আমাদের এখন দুরত্বটা বেড়ে গেছে। আর ও পেয়েছে নতুন মানুষ। এদিকে আমি তো ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছি।

সময়ের সাথে সাথে আমাদেরও বদলানো উচিত। কিন্তু আমি তো এখনো পড়ে আছি চার দেওয়ালের মাঝে। আস্তে আস্তে আমি কলেজের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে প্রায় এক বছর দু মাস পরে আমি আমার ধার দেওয়া টাকাগুলো ও আমার ক্যালকুলেটর ফেরত চাই।

একদিন আমার টাকার খুব দরকার থাকায়, আমি ওইদিন তিন থেকে চারবার ফোন করেছিলাম, আর বলল, বিকেলে দিবো টাকাগুলো। তাই বিকালে যে স্থানে দাঁড়াতে বলেছিল ওখানেই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আসার কোনো বালাই নেই। তাই আবার ফোন করে বলল, আসছি। এই বলে আমি আরো কুড়ি মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু আসে নি। তাই বাড়িতে চলে আসি। আর রাগে ফোন বন্ধ করে রাখি। রণ আমাদের বাড়িতে আসে আর প্রথমেই আমাকে বলে, শুধু টাকার জন্যই ফোন করিস? এমনিতে তো করিস না?

তারপর আমাকে সাথে সাথে মাত্র দুইশত টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি নিতে অস্বীকার করেছিলাম এবং তেমন কোনো কথা বলতে চাই নি ওর সাথে। শুধু বলেছিলাম, আমার আর টাকা লাগবে না, আমার ক্যালকুলেটরটা দিয়ে যাস।

এটা হয়ে যাওয়ার তিনদিন পর আমার আরেক বন্ধু অনুপমের বাড়িতে যাই। দেখি ওর টেবিলের উপর সুন্দর কাঠের হরিণ রাখা আছে। আমি শুনলে বলল, ওটা রণর আমার না। আমি বললাম, তাহলে তোর বাড়িতে কেন? কত দাম নিয়েছে? অনুপম বলল, শুনলাম কাকে দেবে। আর দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। এটা দেখে আরো বেশি রাগ হল আমার যে নিজের ধার না মিটিয়ে কত কিছু করা হচ্ছে। পরে একদিন দুপুরে গিয়ে এক প্রকার জোর করে ক্যালকুলেটর নিয়ে আসি এবং বলল, পরে টাকা দিয়ে দেবো।

আমাকে ফেসবুকে এবং Whatsapp এ অনেকবার ভুল স্বীকার করলেও আমি আর কথা বলি নি। ফোন করে অনেক সময় কথা বলেছিল। কিন্তু আমার উত্তরগুলো ছিল, হ্যাঁ অথবা না। তাই শেষমেশ আমাকে টাকা পাঠিয়েছিল অন্য একজনের হাত দিয়ে কিন্তু সেই টাকা আমার প্রয়োজনের সময় কোনো কাজ হয় নি।

একই ভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেলো। তারপর একদিন আমি, বিশ্ব, প্রতাপ আর অনুপম ঘুরেত বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় রণর সঙ্গে দেখা। আমার সাথেই গেলো, কিন্তু আমার সাথে কোনো কথাই বলল না। সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে

কথা বলছিলো। আর আমি সবার কাছ থেকে একটু দূরে দাড়িয়ে। আর আমি মনে মনে অনেক কিছু ভাবছিলাম। রণ আমাকে উদ্দেশ্য করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আমার পুলিশের চাকুরি হয়ে গেছে, তোদের সবাইকে পাটি দেবো চলে আছিস। আর কেউ না আসলেও চলবে।

এই কথা শোনার পর আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন ছিল। মেনে নিতে পারছিলাম না যে শেষপর্যন্ত আমাকে এই কথাগুলো শুনতে হল। চোখ দিয়ে কেমন জল বেরিয়ে যাচ্ছিল। এবং আরো অনেক কথা বলছিল, শুনতে না পেলে আমি দূরে সরে গেলাম। সবার সামনে কাঁদতে ইচ্ছে করলেও পারিনা। ভাবছিলাম, জীবন বাজি রেখে আমি কার জন্যে বিনা স্বার্থে এতো কিছু করলাম! ব্যাপারটা বুঝে অনুপম আমার কাছে এসে দাঁড়াল আর বলল, মাথা ঠান্ডা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। পরের দু'দিন আমার ফোন বন্ধ ছিল। ঘরে প্রায় বন্ধ রেখেছিলাম নিজেকে। কারো সাথে যোগাযোগ রাখিনি। বাড়ীর লোক কিছু শুনলে বলতাম, পরীক্ষার চাপের জন্য পড়ছি। অনুপম সব কিছু বন্ধ পেয়ে বাড়ি চলে আসছিল, আমাকে ঘুরতে নিতে চাইলেও আমি যাইনি। দুঃখটা এতোটাই কাঁদাচ্ছিল যে সবার সাথে যোগাযোগই বন্ধ করে দিই আর রণর কথা তো বাদই দিলাম।

ভুলতে শুরু করলাম সব স্মৃতি। দেখতে চাইনি আর চেনামুখগুলো। হাসতে চাইনি এক সাথে। ও হতে চাইনি থ্রি ইন্ডিয়টস ফিল্মের মতো। অন্য কোনো গুল্লে ফিল্মকে অনুসরণ করতে।

ক্রিকেট খেলা ভালো লাগলেও আর খেলা হয় না আমার। আর বন্ধ হয়ে যায় খেলা নিয়ে আলোচনাও। কলেজ শেষ হবার সাথে সাথে আমিও বাড়ী ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বাড়ীতে এলেও আমি কারো সাথে দেখা করিনা ইচ্ছে করে। কাউকে বলিনা কোথায় থাকি বা কী করি। কিন্তু আমি কোনো সরকারি চাকুরি করিনা এটাই বলি। কলেজ শেষ হবার পর কেটে গেছে তিনটি বছর। শুধু ঘুরে বেড়াই আর দেখি মানুষের জীবিকাধারনের উপায়গুলো। এই কয়েকবছর দেখেছি অনেক কিছু। ভুলতে বসেছি পুরানো জিনিসগুলো, বুঝতে শিখেছি আমাদের হিসেব মতো সব কিছু চলেনা যখন তখন সবকিছু মানিয়ে নিতে হয় পরিবেশের সাথে। ল্যামার্কের মতবাদের মতো, নিজের অস্তিত্ব বা স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হয়। যেখানে পথের শেষ দেখা যায়, আর সেখান থেকেই অন্য কোনো পথের খোঁজ মেলে।

আমার ঘুমটা না আসার কারণ বড় অদ্ভুত। এই চার দিন আগে আমি বাঁকুড়া-অযোদ্ধা হাইরোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দেখলাম, রাস্তার পাশে ভিড় জমে আছে। একটু এগোতেই দেখলাম একটি বাইক ও একটি গাড়ীর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত অবস্থায় পড়ে আছে একজন লোক। লোকটাকে দেখে আমার চেনাচেনা মনে হল। তাই আরো দ্রুত এগিয়ে গেলাম। হেলমেটটা সবাই ধরে খুলতেই বেরিয়ে এলো আমার এক অতি পরিচিত চেনা মুখ। তার পা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। হাত মনে হল ভেঙ্গে গিয়েছে, বুকেও ব্যথা পেয়েছে। এবং মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছে ফলে চোখ খুলতে পারছে না। ইতিমধ্যে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। খুবই গুরুতর অবস্থা। আপাতত তেমন কিছু আর বোঝা যাচ্ছেনা। অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। তাই আমি তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাই। আমি তাকে সব দায়িত্ব নিয়ে ভর্তি করাই এবং ওর বাড়ীতে খবর জানাই। যেহেতু পুলিশের চাকরি করতো তাই খবরটা দিতে বেশি দেরি হয়নি। এর মধ্যে ডাক্তারবাবু জানালো, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্যে রক্তের প্রয়োজন। তারপর বাদবাকি সব করা হবে। রক্তের গ্রুপ একই হওয়ায় আমি দিতে রাজি হয়ে যাই। তাই আর কোনো সমস্যা পড়তে হয়নি। কিছুক্ষণ পরই পুলিশটির বাড়ীর লোক, তার স্ত্রী ও সন্তান হাসপাতালে আসে। পুলিশের চাকরি তো? তাই ট্রান্সফার হয়ে এখানে আসতে হয়েছিলো।

পুলিশটির স্ত্রী আমার কাছে জানতে চাইলো, আপনি কে? আপনার নাম কী? এত কিছু করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলাম না, শুধু বললাম, এটা আমার মানুষ হিসেবে কর্তব্য। আমাকে যেতে হবে। কাজ পড়ে আছে আমার।

এটা বলার পর বেরিয়ে আসতে চাইলাম, কিন্তু পিছন থেকে দাদা বলে ডাক দিলো আর ফিরে দাড়িলাম। বললাম, কী হয়েছে, কোনো চিন্তা করবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে।

উত্তরে বলল, ও তো আইসিইউতে আছে। বাড়ী থেকে লোক আসতে দেরি হবে। আমি একা এখানে আছি। দয়া করে, রাতটা যদি থেকে যেতে।

ঠিক আবদারটা আমি ফেলতে পারি নি, তাই আমি রাতটা থাকলাম। সকালে বাড়ীর লোক পৌঁছাবে, আমিও তাদের দেখা দেবো না ভেবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম চলে যাওয়ার জন্য। রাতে ঘুমোই নি এক ফোঁটাও। কিছু সময় ওদের বাচ্চাটি আমার কোলে ঘুমিয়ে ছিলো।

কাঁদছিলো বোনটি আর আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলো। শুধু বললাম, ওর কাছ থেকে শুনে নিও।

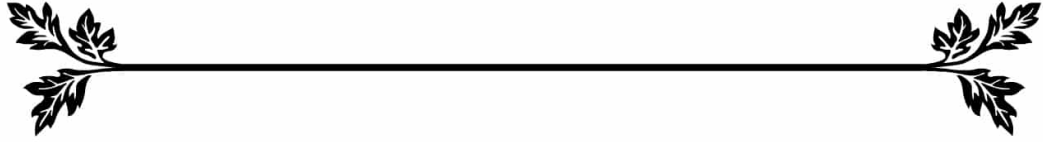
আর নামটি বলেছিলাম, শেহবাগ। যেটা আমাকে ও ক্রিকেট খেলার সময় ডাকত।

পুলিশটির জ্ঞান ফিরল আর জানতে চাইছিল, কে হাসপিটালে নিয়ে এসেছে?

সন্তান কোলে করে আমার দিকে দৌড়ে আসলে আমাকে পাই নি। কারণ আমি বুঝতে পেরে একটি দেওয়ালের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিলাম। তার আগে আমার ব্যাগ থেকে ডায়রি বের করে লিখে রেখেছিলাম, “তোর সব থেকে বড় শত্রু, চোখ বুঝলে আমাকে দেখতে পাবি।”

আমি লুকিয়ে দেখছিলাম একে একে আইসিইউয়ের সামনে বাড়ীর লোক হাজির হল। আর ভেতরে বোনটি ওকে আমার লেখা দেখালো এবং দেখেই মুসকি হাসি দিয়ে চোখ বন্ধ করল, সাথে সাথে চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল।

বোনটি বেরিয়ে আমাকে আবার খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমাকে আর পেলো না। হাসপাতাল থেকে আমি লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ত্রিশ মিনিট বাদে আমার মা আমাকে ফোন করে বলল, রণ নাকি এক্সিডেন্ট করেছে, তোর খোঁজ করছে। মাকে বললাম, হ্যাঁ আমি জানি। সুস্থ্য হলে আমাকে জানিয়ে দিও। আর নম্বরটা কাউকে বলো না। ঘুমটা আর হল না। সকাল হতেই আমার নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম নতুন কোনো জায়গাতে।



সত্যিই কি স্বপ্ন ছিল !

সুমন সাধুখাঁ, চতুর্থ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

কানে হেডফোন দিয়ে ঘরে বসে একা একা গল্প প্রায়ই শুনেই থাকি। কোনদিন ভৌতিক কোনদিন রহস্য কোনদিন অলৌকিক আর তার সঙ্গে তো হাসি মজার গল্প আছেই। ঠিক একদিন মধ্যদুপুরে ঘরে যথারীতি মত কানে হেডফোন দিয়ে এক ভৌতিক গল্প শুনতে থাকলাম। গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। পরে ঘুম থেকে উঠে আমি যা হতভম্ব হয়ে ছিলাম তা বলে বোঝানো কল্পনাভীত।

গল্পটা শুরু হয় সাধারণ কাহিনী নিয়ে -- দুটো 17 বছর বয়সী ছেলে YouTube ভিডিও করবে বলে নানান পুরনো বাড়ি খুঁজতে বের হয়। আর তাদের YouTube video এর কন্টেন্ট ছিল পুরনো বাড়ি পর্যবেক্ষণ। সেখানে তারা পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন নতুন কিছু অচেনা বিষয় ইউটিউব ভিডিওতে তুলে ধরবে। পুরনো বাড়িতে ফাঁকা জায়গা খুঁজতে ওদের বড় বড় দেয়াল হয়েছিল বিকেলে বার হয়ে ভিডিও শুট করতে প্রায় সন্ধ্যা। এদের একজনের নাম করুন আর অন্যজনের নাম ছিল জ্যোতি। করুন আর জ্যোতি সেদিন দুজনে একসাথে বার হয়েছিল সঙ্গে আর কাউকে পায়নি, যারা তাদের সঙ্গে কাজ করত তারা সব ভ্রমণে গিয়েছিল। করুন জ্যোতিকে বলল, ঠিক এই পর্যন্ত গল্পটা যখনই শুনেছি বাকিটা আবছা হয়ে আসছে। চোখে ভীষন ঘুম আর পারলাম না ঘুমিয়ে পড়লাম মোবাইলটা অফ করে।

(ঘুমের মধ্যে ঘটনাটি.....)

এই জ্যোতি আজ পুরনো বাড়িতে আমরা রাতের দিকে রিসার্চ করব। কিরে কথা বলছিস না কেন?

- আরে না তোর কি কোন ভূত-পেতের ভয় নেই।

-দেখ ভাই জ্যোতি আমরা যদি ভিডিও শুটিং এর কাজ রাতের দিকে করি তাহলে লাইক, ভিউজ, সাবস্কাইব এর চিন্তা করতে হবে না। জ্যোতি একটু ভেবে নিয়ে আমাকে বলল-

- সেটা ঠিক কিন্তু আমি আর তুই একা যাবো? শুনেছি বাড়িটাতে অনেক বছর লোকজনের আসা-যাওয়া বন্ধ তাছাড়া রাতের দিকে গেলে যদি কিছু হয়ে যায়। তারপর জ্যোতি আবার এদিক ওদিক ঘুরে এসে আমাকে বলল, আমরা বিকেলে যাব আর ঠিক সন্ধ্যার দিকে শুট করে সাতটার মধ্যে বাড়ি চলে আসব।

- ঠিক আছে তাইই হবে।

বিকেল চারটের দিকে আমরা ওই পুরনো বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। সঙ্গে ছিল দুটো সাইকেল আর ভিডিও শুটিং এর কিছু জিনিসপত্র। বাড়িটা গ্রামের থেকে দু'মাইল মতো দূরে ছিল। জ্যোতি আমাকে বলে উঠলো,

- এই দেখ আকাশের অবস্থা খুব খারাপ, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

বলতে বলতে মুসলধারে বৃষ্টি এসে গেল। আমি আর জ্যোতি ঘরের কোণে আশ্রয় নিলাম কোন রকমে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। বৃষ্টি থামতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক লেগে গেল। প্রায় সন্ধ্যা আমি জ্যোতিকে বললাম নে ভিডিও শুট এর কাজটা কমপ্লিট করে নিই।

- হ্যাঁ তুই ক্যামেরাটা ঠিক করে ধর বাকিটা আমি দেখছি।

শুটের কাজ শেষ হতে আরো ঘন্টা খানেকের সময় লেগে গেল। জ্যোতি বলল,

- এবারে বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, তাছাড়া সন্ধ্যাতো রাতের দিকে পাড়ী দিচ্ছে।

-চল তাহলে, এই জ্যোতি রাস্তায় তো জল আর কাদা। সাইকেল চালিয়ে যাওয়া যাবে না মনে হচ্ছে। জ্যোতি বলে উঠল,

- তাতে কি হয়েছে দরকার হলে সাইকেল মাথায় নিয়ে যাব।

- এই কথা বলে জ্যোতি সাইকেলটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল আর আমাকে বলছে আমার পিছন পিছন আয়। বেশ অন্ধকার কেমন যেন অস্বস্তিকর পরিবেশ, বাড়ির ভেতরে অনেকগুলো রাস্তা যাবার পথে লক্ষ্য করেছিলাম। জ্যোতি রাস্তা ধরে চলেছে আর আমাকে বলেছে,

- ভাই ভিডিও এডিটিংটা ভাল করে করিস।

-হ্যাঁ করব। আর ভিডিওটা দুই-তিন দিনের মধ্যে আপলোড করার চেষ্টা করব। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি জ্যোতিকে বলে উঠলাম এই তুই কি আমার সঙ্গে মজা করছিস।

-কেন মজা করবো ভাই।

সেই জায়গায় তো আমাকে নিয়ে আসলি যেখান থেকে আমরা ভিডিও শুটিং এর কাজ করছিলাম। জ্যোতি চমকে বলল,

-কি করে হলো এটা! আমি তো ঠিক পথেই যাচ্ছিলাম।

-ঠিক আছে আবার চল, এবার ভালো করে পথ দেখে যাবি। জ্যোতি আবার চলতে শুরু করলো।

কিন্তু অবাক করা কাল্ড, সেই স্থানেই এসে পরলাম। আমি তো বিরক্ত হয়ে গেলাম, আর জ্যোতি পায়চারি করতে লাগলো সঙ্গে আবার কি সব বিড়বিড় করতে লাগল। জ্যোতি চোখে মুখে কিছুটা ভয় নিয়ে আমাকে বলল,

-মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

-আমি মোবাইলের ফ্লাশ লাইট টা ধরে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম, এই জ্যোতি এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয় তো? একটা বিশী জায়গায় এসে আমরা ফেসে গেছি মনে হয়। এবার জ্যোতি বলে উঠল,

- এই লক্ষ্য কর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা বাতাসের মিশ্রিত পরিবেশটা কেমন যেন ঘুমসে গরমের অস্বস্তিকর পরিবেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাড়ির চারপাশের ভাঙ্গা দেওয়াল, ফুঁটো ছাদ, কার্নিশ যেন নিমেষের মধ্যে পাল্টে গেল এক রাজবাড়ির মতো সুন্দর বাড়ি তৈরি হল।

আমি আর জ্যোতি ভয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করলাম। কিন্তু কোন লাভ হল না। শব্দ এদিক ওদিক ঘুরে আমাদের কাছেই ফিরে এল। কী বিস্ময়কর দৃশ্য! জ্যোতি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল রাস্তা আর খুঁজে পাচ্ছে না, আগের রাস্তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। পলকের মধ্যে এক ঝোড়ো হাওয়া উঠে গেল। ক্রমে তা আরো বাড়তে শুরু করলো। ঝোড়ো হাওয়া থেকে রেহায় পেতে দরজার দিকে তুকে পড়লাম কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাড়ির ভিতরে পুরোটাই নিস্তব্ধ। জ্যোতির মুখ থেকে বাক্য হারিয়ে গেছে, প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত। আমার গায়ের লোম শিউরে উঠেছে, হাত পা অবশ। এই অবস্থায় কি করবো কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি জ্যোতির পাশে দাঁড়াতে যাচ্ছি ঠিক তখনই একটা গুনগুন শব্দ শুনতে পেলাম। ভেতরের দিকে ডান দিকের একটা গলি রাস্তা দিয়ে শব্দটা ধেয়ে আসছে এই দিকে। জ্যোতিকে বললাম কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

- হ্যাঁ রে পাচ্ছি। আজ মনে হচ্ছে আমাদের অন্তিম দিন।

- চুপ কর জ্যোতি শব্দ হয়ে দাঁড়া। আর চলতো দেখি কে এই মন্দির গুন গুন করে রব করছে। জ্যোতি কিছুতেই যেতে আগ্রহ দেখায় না। রাস্তার আশেপাশেটা লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত। কিছুটা এগিয়ে দেখি এক পুরোহিত মন্দির পড়ছে। যত এগিয়ে যাচ্ছি পরিবেশটা ততই ঠান্ডা এবং একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ অনুভব করছি। একটা মন্দিরে দরজায় এসে পৌছলাম, পুরোহিতকে আরও কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। এক প্রতিষ্ঠিত মূর্তিকে পূজা করছে। মূর্তিটা অনেক পুরনো বুঝতে পারলাম কিন্তু কি মূর্তি সেটা চিনতে সক্ষম হলাম না। জ্যোতি আমাকে ফিসফিস করে বলল,

- আমার বাবা বলেছিল এখানে কেউ থাকেনা, অনেকদিন ধরে এই বাড়ি জনবসতিহীন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই পুরোহিত কি করে এলো?

আমি জ্যোতি কে কিছু বলতে যাচ্ছি ঠিক এই সময় উত্তর এল গম্ভীর গলায় –

- এই বাড়ির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে আমি পূজো করে আসছি।

জ্যোতি ভূত ভূত বলে আবার চ্যাঁচাতে শুরু করল। আমি থতমত খেয়ে ঢোক গিলে আবার বলতে যাচ্ছি-- আবার একই স্বরে উত্তর এল,

-আর যতদিন এই মন্দির থাকবে ততদিন আমি একই সময়ে পূজো করে যাব।

পুরোহিত তখনও পিছন ঘুরে পূজো করছে। জ্যোতি এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। আমারও গলা ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। শুকনো গলায় চাপা স্বরে বললাম -এই রকম কেন হচ্ছে, আর আমরা বাড়ি যেতে পারছি না কেন?

এবারে পুরোহিত বলে উঠল তোমাদের কোনো বিপদ নেই, ভয় পাওয়ারও দরকার নেই।

এতক্ষণে ভয় কিছুটা কমেছে। আমি বলতে যাচ্ছি, কিন্তু পুরোহিত এর আগেই বলে উঠল-

- বুঝেছি আর বলতে হবে না এমন ঘটনা কেন ঘটল তাইতো?

আমি আবারও অবাক হয়ে গেলাম। পুরোহিত বলল,

- যতক্ষণ এতকিছু তোমাদের চোখের সম্মুখে ঘটেছে তাহলে বাকিটা বলতে আর কি....। এরপর পুরোহিত পূজোর কাজটা প্রায় সমাপ্ত করে বাকি ঘটনা বিবৃত করতে শুরু করলো --

সে দেড়শো বছর আগের ঘটনা যখন এই বাড়িটাতে কেবল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। বাড়িটাতে নির্মাণের কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল দুই জমিদার সাহেব। তারা দুজনে মিলে এই বাড়িটা গ্রামের থেকে একটু দূরে নির্মাণ করেছিল। তখন দুই জমিদারের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। যেকোনো কাজ তারা মিলে মিশে করত। যেহেতু জমিদারের বাড়ি তৈরি হচ্ছিল সেখানে তো একটা মন্দির তৈরি হবেই, এটা বড়ই স্বাভাবিক। তবে দুই জমিদারের মন্দিরে পূজো এইসব সংস্কার এর একদম বিশ্বাস ছিল না। আর তার থেকেও বড় কথা কোনোরূপ ইচ্ছে ছিল না। মন্দির একটা হল বাড়ির মধ্যে। তবে একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটলো। বাড়ি নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে রাতারাতি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়। বাড়ির মন্দিরে মাটির বুক চিরে এক মূর্তি বেরিয়ে আসলো। সবাই হতভম্ব হয়ে রয়েছে মূর্তিটাকে দেখে। আরও অবাক করা বিষয় ছিল মূর্তিটা সোনার। মন্দির মূর্তি যখন সবই রইল, পূজোর বিষয়টা তো এবারে উঠে আসে। দুই জমিদার মিলে পুরোহিত খুঁজতে থাকে, তখন আমার কাঁধে এসে পরে পূজোর দায়িত্বটা। মূর্তির পরিচয়, পূজোর পদ্ধতি সবকিছু জমিদারকে বুঝিয়ে বললে আমাকে রেখে দেওয়া হয় পূজোর জন্য। পূজোর শুরু থেকেই দুই জমিদার সঙ্গ দিতে থাকে- যেখানে দুই জমিদারের কারোরই পূজোর ইচ্ছে পর্যন্ত ছিল না। যখনই পূজো শুরু হতো মন্দিরের চারিদিকে পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে পড়তো। আবার পূজো শেষ হওয়ার পরে স্বাভাবিক পরিবেশটা ফিরে আসত। সবই ঠিকঠাক চলছিল কয়েক মাস। তবে ওরা দুজনে পূজোতে আসা বন্ধ করে দিল বেশ কয়েকদিন ধরে। নিজেদের মধ্যে কি একটা যুক্তি স্থির করেছিল ওরা। আমিও তখন বিষয়টা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। বিকেলের দিকে পূজোর দরকারি সামগ্রী যোগাড় করতে গিয়েছি। সন্ধ্যার দিকে ফিরতে, জমিদার বাড়ির চারপাশ ঘিরে দেখি গ্রামের মানুষের কোলাহল চলছে। মানুষের মধ্যে আলোচনা চলছে কি করে মরল দুই জমিদার তাও আবার একই সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ভীর ভেঙে বাড়ির মন্দিরে ঢুকে দেখি দুই জমিদারের মৃতদেহ পড়ে আছে। মূর্তিসহ মন্দিরের আশেপাশে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। দেখি আরেকটা মূর্তি রয়েছে, যেটা একই রকমেরই দেখতে। মূর্তির কাছে এসে দেখলাম, আসল মূর্তিটাকে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছিল, শাবলের কিছু ঘা মূর্তির চারপাশে চিহ্নিত হয়ে আছে। যেখানে একই রকমের সোনালি রং করে মুক্তি বসানোর কথা ছিল।

-কি করে মরল বিষয়টা কারো কাছে পরিষ্কার না হলেও, আমার বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না। একটু গম্ভীর গলায় পুরোহিত বলল --দুদিনের ঈশ্বরভক্তি।

- সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিকে প্রণাম করে পুরোহিত বলল যাও তোমরা ফিরে যাও।

-আমি পুরোহিত কে একটু সাহসের সঙ্গে বললাম তাহলে পূজোর পদ্ধতি, আপনার সঙ্গে জমিদারের দেখা, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

পুরোহিত হো হো হো করে হেসে উঠলো। যাও তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আমি তাড়াতাড়ি করে জ্যোতিকে তুলে নিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে যেতে থাকলাম। জ্যোতি আস্তে আস্তে চোখ খুলল আর বলল,

আমরা ঠিক আছি তো? ভূতটা কোথায়?

-আমি কোনো কথার জবাব এখন না দিয়ে বললাম, এবার চলত বাইরের রাস্তার দিকে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ির চেহারার আবার পরিবর্তন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। চারিপাশের আবহাওয়া আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলো। ঝোড়ো হাওয়ার প্রকাণ্ড তেজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকলো। আমি আর জ্যোতি দৌড়াতে থাকলাম যতক্ষণ না বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে আসলাম। এতক্ষণে জ্যোতি হাজারো প্রশ্ন আমাকে বলতে শুরু করেছে। আমি জ্যোতির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ জলে কাদায় পরিপূর্ণ রাস্তায় পিছলে পড়ে গেলাম।

-চাঁচিয়ে ঘুম থেকে উঠে খাটের উপর বসলাম। এ কি স্বপ্ন! মনে পড়ে গেল মোবাইলের শোনা গল্পের কথা। ভয়ে ভয়ে মোবাইলটা তুলে দেখি হেডফোন লাগানো অবস্থায় পড়ে আছে। ঠিক ঘুমানোর আগের মুহূর্ত, যেখানে গল্পটা আমি pause করে রেখেছিলাম। মনের মধ্যে কেমন অদ্ভুত অস্বস্তি কাজ করছে। আমি মোবাইলের pause করা অংশটা আবার অন করে গল্পটা শুনতে থাকলাম। পায়ের পাতার লোম থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সিউড়ে গেল। স্বপ্নে দেখা অংশের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পড়ন্ত বিকেল কেউ যেন গভীর অন্ধকার রাত মনে হচ্ছে। পিছলে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত স্বপ্নের ঘটনা যেন আমার সম্মুখে ঘটেছে শুধু আমার জায়গায় 'করুন' বাকি সব একই। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকার পর মনে হল আমি তো রাস্তায় ছিলাম তবে মোবাইলের গল্পটা এখনো তো বাকি আছে। বাকি অংশটা চালাতে গিয়ে দেখি-- করুনকে জ্যোতি বলল যা পড়ে গেলি! মনে হয় ভুতে ফেলে দিয়েছে। একথা অগ্রাহ্য করে মনে মনে ভাবতে থাকল পুরোহিতটাকে তো একবারও সামনে থেকে দেখতে পারলাম না। এরই মধ্যে জ্যোতি করুন কে আরও অবাক করা বিষয় বলে উঠল করুন, ঘড়িতে সাতটা বাজে সময় তো একটুও পরিবর্তন হয়নি.....।



Alpona, Didhiti Raha, 6th Semester, B.Sc. Programme

মহাপাপিষ্ট

সুমন সাঁধুখা, চতুর্থ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আমি আর সুদীপ ফাঁকা কোন মাঠ বা নদীর ধারে ঘুরতে যায়। অফিসের প্রচুর কাজের চাপে ব্যস্ত জীবনকে বিকেলের সতেজ বায়ুতে সঁপে দিই আরকি। আমরা দুজনে বেশিরভাগ দিন নদীর ধারের ফাঁকা কোনো স্থানকে বেছে নিই। নদীর ধারের ঠান্ডা বাতাস যেন পুরো শরীর, মনে অন্য মাত্রা এনে দেয়। তবে বলে রাখি আমরা যে নদীর ধারে বসে থাকি সেখানে একটা ছোট্ট শ্মশান ঘাট আছে, গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হয় খুব কম মানে, বিশেষ কারণে মৃতদেহ দূরের কোনো স্থানে না নিয়ে যেতে পারলে এখানে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘাটের পাশে একটা ছোট ছোট ধাপ করে সিঁড়ি দেওয়া আছে। মাস চারেক বোধহয় কোন মৃতদেহের অবশিষ্ট ছাই ওই নদীতে পড়েনি। নদীর ওপারে একটা ছোট্ট ঘর আছে যেখানে একটা লোক থাকে, যে কাঠগুলো সরবরাহ করে আর একটা নৌকা নিয়ে কিছু লোকজনকে পারাপারের কাজ করে।

বেশ কয়েকদিন কাজের চাপে জড়িয়ে আছি। মধ্যে চার দিন মত হয়েছে, কোথাও ঘুরতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ একটু সুযোগ হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে পড়লাম আমি, সুদীপ একটু ব্যস্ত থাকার জন্য আজকে বেরোতে পারল না আমার সঙ্গে। নদীর ধারের ওই জায়গাটা এত মিষ্টি যে ওখানে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করে ওঠে। কিছুক্ষণ পর সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। কুঁড়ে বাড়িটার চারপাশে একটু ভিড় জমেছে, মোটামুটি চার পাঁচটা লোক নিজেদের মধ্যে কি সব বিড়বিড় করছে। এপার থেকে নৌকা নিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁক পারছে একজন। আর একটা মাঝি নদীর এপারে নৌকাটা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বিষয়টা বুঝতে না পেরে, কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে বলল,

-ওই আজ সকাল থেকে কালো মাঝির বড় শরীর খারাপ, তাই আমরা কয়েকটা মাঝি মিলে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া ওনার তো কেউ নেই একা থাকেন এখানে। নৌকা বেয়ে আর কাঠ বেঁচে কোনো রকমে খাবার ব্যবস্থা করে মোটামুটি দিন চালিয়ে নেন।

-আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, বললাম -তাহলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসুন। এরকম কথা শুনে আজ মনটা একটু খারাপ হলো। ভাড়া বাড়িতে ফিরে আসলাম কিছুক্ষণের মধ্যে।

সন্ধ্যার পর ডিনার টাইমে আমি আর সুদীপ মাঝি কে নিয়ে একটু আলোচনায় বসলাম। খাওয়া শেষ হলে সুদীপ নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও একটু অফিসের কাজকর্ম করে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা বেদনাদায়ক কাতরের শব্দ শুনে। দেখলাম পাশে শুয়ে সুদীপ পেটে হাত দিয়ে গোঁড়াচ্ছে। আমি বললাম কি হল রে তুই এমন করছিস কেন?

-আর পারছি না খুব পেটে যন্ত্রণা করছে রে। -আমি আর দেরি না করে সুদীপকে কাছের একটা হসপিটালে নিয়ে গেলাম। সুদীপ কে ভর্তি করিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসে বসলাম। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি ঘড়ির কাঁটা 2.30 a.m.। নিশ্চয় রাতে আমি একটু হসপিটাল এর বাইরে খোলা মাঠের ধারে একটা গাছের গুড়িতে এসে বসলাম। মিনিট দশেক পর দেখি মাঠের ডান পাশ থেকে এক বুড়ো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মুখটা স্পষ্ট হতে লাগল। চিনতে পারলাম, এ তো সেই শ্মশান ঘাটের মাঝি। এখানে কি করছে, দেখিতো একটু জিজ্ঞেস করে। আমি জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার আগেই বুড়ো এদিকে এসে বলল-

-পেটের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখানে নিয়ে আসলো কয়েকজন তারপর কি সব করতে থাকলো। শরীরে সূচের পর সূচ বিঁধতে থাকলো, কয়েকটা ওষুধ খাওয়ালো, এবার একটু সুস্থ বোধ করছি। আমি বললাম,

-আপনার তো এখনো ভর্তি থাকার কথা। আর এত রাতে এখানে কি করে এসে পড়লেন। মাঝি বলল,

- ওদের কথা অনুযায়ী এখনও বেড়ে শুয়ে থাকার কথা, তাও চলে এসেছি এখানে। ওখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না। এই ফাঁকা মাঠে একা বসে ছিলাম তারপর দেখলাম তুমি বসে আছো তাই চলে আসলাম, এই দিকে।

আমি বললাম তার মানে আপনি লুকিয়ে চলে এসেছেন।

- হ্যাঁ ঐরকমই কিছুটা বলতে পারো।

-এটা তো আপনার একদম ঠিক কাজ হয়নি।

-সে পরের কথা মাঝি বলল। তবে জানানো আমি ভেবেছিলাম আমার কেউ ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে না আমি হয়তো ওখানে মারা যাব। কিন্তু তা হলোনা আমি বেঁচে আছি দেখো।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললাম আমি আপনাকে প্রায়ই দিনই লক্ষ্য করতাম যখন বিকেলের দিকে শ্মশান ঘাটে ঘুরতে যেতাম।

-ও তাহলে আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

জানেন তো আমাকে ভালবাসার মত কেউ নেই, তবে আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কেউ তো আছে, কেউ তো আছে যে আমাকে ভালবাসে। আপনাকে একটা কথা বলব, আপনি বড় ভালো মানুষ।

আমি একটু হেসে বললাম,

- আচ্ছা বলুন কি বলবেন।

-হ্যাঁ শুনুন তাহলে আমার একটা জমি পড়ে আছে, আর সেটা কয়েকজন দখল করে কি সব ফ্লাট টলাট তৈরি করেছে। আমি অতশত বুঝি না তবে আমার কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিল ওরা। জানেনতো আমার কত জমি ছিল আর যে জমিটুকু আমার সম্বল ছিল সেখানে কত ফুল গাছ ছিল, কত ছোট ছোট গাছ ছিল আর একটা ছোট সময় কাটানোর মত একটা ঘরও ছিল। আমি ওখানে অনেক ভালো ছিলাম। আরো অনেক কথা, না থাক।

-কেন বলুন? তবে আপনি কি একাই থাকতেন, আপনার ফ্যামিলি মানে আপনার আর কেউ ছিলনা।

-হ্যাঁ ছিল। আমার দুটো নানা একটা ছেলে ছিল। আর আমার স্ত্রী একটা দিন আমাকে ছেড়ে ইহ লোকে গমন করেছে।

-ও.....। তাহলে আপনার ছেলে কোথায়?

-ছেলে ও তো পাগল হয়ে গেছে। ওকে ওই ওরা পাগল করে দিয়েছে। এখন ও কোথায় আছে আমি কিছু জানিনা।

চোখের জল ছল ছল করেছে মাঝির। আবার কিছুক্ষণ থেমে বলতে শুরু করল

আমার সঙ্গে যারাই এমন করেছে তাদের কোন দিন ভালো হবে না আমার মত অবস্থা তাদের হবেই। হ্যাঁ আমার মত অবস্থা তাদের হতেই হবে।

বলে মাঝি উঠে চলে গেল। অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমি মনে মনে ভাবলাম এটা মাঝির সঙ্গে একদম ঠিক হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসলো সুদীপের। আমি ফোনটা কেটে দিয়ে সুদীপের রুমে পৌছলাম। সুদীপের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। কেমন বোধ করছি?

-হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে। তবে জানিস আমার কাছে ওই বুড়োটা এসেছিল।

আমি বললাম –

কোন বুড়োটা?

-ওই মাঝিটা, আমরা প্রায় দিনই যাকে ওই শ্মশান ঘাটে দেখতাম।

আমি বললাম কখন এসেছিল রে?

-এই তো ঘন্টা খানেক আগে।

-আর চলে গেল কখন?

-আরে তোকে ফোন করলাম না তখনই চলে গেল। দুঃখ কষ্টের জীবনের কিছু গল্প করল আমার সঙ্গে।

-একটু অবাক হয়ে গেলাম আমি। বললাম কিন্তু মাঝি যে এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল। আমার সঙ্গেও তো অনেক গল্প করল। সুদীপ ও চমকে বললো,

-তা কি করে সম্ভব। না না কোথাও তো কিছু ভুল হচ্ছে।

-আমার পাশের রুমে ভর্তি ছিল ওই মাঝি। দেখে আয় তো।

-আমি কোন কথা না বাড়িয়ে চলে গেলাম পাশের রুমে। অন্য একজন শুয়ে রয়েছে দেখলাম। নার্সের সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে আর একজন বুড়ো মানুষ ছিল না?

-হ্যাঁ ছিল তো ঘন্টা খানেক আগে। উনিতো মারা গেছেন আর কিছুক্ষণ আগেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। কেন বলুন তো, আপনি কি ওনার কোন রিলেটিভ?

-না সে রকম নয়। ঠিক আছে, বলে রুম থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে আসলাম। মাথায় কিরকম একটা দুশ্চিন্তা হতে শুরু করলো। কয়েক পা এগিয়ে দেখি কয়েকটা লোক, হ্যাঁ ভালো করে চিনি ওদেরকে। মাঝি কে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো কিছু বুঝতে পারছি না কি সব হচ্ছে।

সুদীপের ঘরে প্রবেশ করে বললাম, মাঝি ঘন্টাখানেক আগে মারা গেছে তাহলে আমাদের সঙ্গে গল্প করল কে?

-বলিস কিরে? নানা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে। নার্স ডাক্তাররা ওরকমই বলে থাকে, এসব ভাবনা বাদ দিয়ে মাথার থেকে এখন।

-আমি বললাম তাহলে দুজনের সঙ্গে একই বিষয় যে ঘটেছে। সুদীপ বলল বাদ দে, ছাড় ওই সব কথা।

-তোরতো ছুটি নেওয়ার সময় হয়েছে... সুদীপের ছুটির রিসিভ টা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসলাম। এরপর তিন দিন কেটে গেল। সুদীপ এখন পুরোপুরি সুস্থ। আজ অফিসে রওনা দেব ভাবছি, অনেক কাজের চাপ পড়ে গেছে। আমি আর সুদীপ কোনরকমে ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে রওনা দিলাম অফিসে। অফিসে প্রবেশ করে নিজেরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও মাঝির কথাগুলো মাঝে মাঝে মনে ভাসতে থাকলো। আর ভেবে কোন কাজ নেই, আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরলাম। সুদীপ দেখি পাশে ইতস্তত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কি হয়েছে বলতে বলল,

- আরে দুজন কর্মচারী আজ মারা গেছে। আমি বললাম কি করে মারা গেছে?

- তোকে বলেছিলাম না একটা প্রজেক্ট নিয়ে ছিলাম আমরা, যেখানে খোদাইয়ের কাজ চলছে। কি বিদ্রোহী ব্যাপার দেখ খোদাইয়ের কাজ দেখতে গিয়ে আমাদের দুজন কর্মচারী মারা গেল।

আমি এই প্রজেক্টের কাজটাকে তেমনভাবে এখনো দেখে উঠতে পারিনি। মানে আরকি এই কাজের উপরে এখনো মাথা গুজিনি। প্রায় সব দায়িত্বই সুদীপ একা সামলাচ্ছে। সুদীপ এখনো পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষন্ন একটা মুখ করে, মোবাইলটা হাতের মধ্যে নিয়ে কি একটা বিড়বিড় করতে থাকলো। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,

- বুঝলি আপাতত আর কোন কর্মচারী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মানে সবাই কোনো না কোনো প্রজেক্ট -এর সঙ্গে যুক্ত। মনে হচ্ছে কাজটা আমাকে আর তোকেই সম্পন্ন করতে হবে।

-আমি বললাম ওকে, নো প্রবলেম।

অফিস শেষ করে বাড়ি ফিরে সেদিন রাতে সুদীপ প্রজেক্টের কাজের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোকে আমাকে একটু অবগত করালো।

পরের দিন অফিসের টাইমে আমরা পাড়ি দিলাম প্রজেক্টের বাকি কাজ সম্পন্ন করতে। যথাস্থানে পৌছলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ফাঁকা জমির উপর খোদাইয়ের কাজ চলতে চলতে বন্ধ হয়ে আছে। চারপাশে একটু ঘুরে জমিটা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মাঝির কথা মনে পড়ে গেল। অনেকটা বর্ণনা মিলে যাচ্ছে, যেটা মাঝি তার নিজের জমির সম্পর্কে যা আমাকে বলেছিল।

এই সুদীপ এই জমিটা অনেকটা মাঝির জমির বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না।

-ওহো তুই এখনো মাঝির কথা ভুলতে পারিস নি। আর যদিও বা মাঝির জমির হয়ে থাকে প্রবলেমটা কিসের। জমির ব্যাপারটা তো ম্যানেজারে বুঝবে আমাদের যে কাজ সে কাজটা করি। আর ওইসব মাঝি-টাঝি জমির কথা বাদ দে তো, বলে সুদীপ নিজের কাজে মন দিল।

আমিও ওর কথা মতো ওর সঙ্গে কাজে মন দিলাম।

ইতিমধ্যে ফোন এসে পড়ল ম্যানেজারের যে এখানের কাজ স্থগিত রাখা হোক। সুদীপ কে জিজ্ঞেস করলে বলল,

- এই জমি নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কাদের যেন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের কাজ স্থগিত রাখতে হবে, ভালোই হলো আজ একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। চল আজ একটু ঘুরে আসি কোথাও থেকে, অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি।

-আমি বললাম এখন আর কোথায় যাবি? অনেক ক্লান্ত আছি। ঘুমোতে হবে বেশি করে, বাড়ি চল। অন্য কোন ছুটির দিন যাওয়া যাবে।

- ঠিক আছে তাই-ই হবে। বলল সুদীপ।

বাড়ি পৌঁছে দেখি আমার থেকেও সুদীপ বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুদীপ বলল,

-এই শোন আমি একটু ঘুমিয়ে নিলাম, এই ঘণ্টা খানেকের মত। ডিনারের টাইম হলে একটু ডাকিস।

-আমি একটু হেসে নিয়ে বললাম, না ডাকবো না, তোর খাবারের ভাগটা সব একাই খেয়ে নেব। ওকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নে টাইম মতো ডেকে নেব। সুদীপের পাশে আমি একটা বই নিয়ে পড়তে থাকলাম, আধঘণ্টা মত হচ্ছে বইটা পড়ছি আর তারই মধ্যে সুদীপের ফোনে অনবরত ফোন কল আসছে। আমি সুদীপকে ডিস্টার্ব না করে ফোন কলটা রিসিভ করলাম। অফিসের সহকর্মীর ফোন।

-হ্যাঁ হ্যালো শুনছেন, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অফিসের ম্যানেজার কে হত্যা করা হয়েছে। আর যারা হত্যা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন ধরা পড়ে গেছে। আর বলছে, আপনি নাকি এই হত্যার পেছনে যুক্ত আছেন। হ্যালো, হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন, কিছু বলছেন না কেন?

-আমি কোনো কথা না বলে ফোনটা রেখে দিয়ে সুদীপকে ডাক দিলাম। সুদীপ উঠে বলল,

-কিরে ডিনারের টাইম হয়ে গিয়েছে নাকি।

-না এক সহকর্মী অফিস থেকে ফোন করে কি সব বলছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। - মানে, কি বলছে?

-ম্যানেজারের হত্যা হয়েছে আর এই হত্যার পিছনে নাকি তুই আছিস?

-ওহ নো, তাহলে বিমল ব্যাটা ধরা পড়েছে। কোন কাজ ঠিক করে করতে পারে না। আমি ওকে কত করে বললাম যে এইসব কাজ সাবধানে করিস।

-আমি পুরো হতবাক হয়ে গেছি। মানে তুই..... সুদীপ আমাকে চুপ করিয়ে বলল,

-এখন কিছু বলবার সময় নেই। আমাদের হাতে সময় অনেক কম। চল আমার সঙ্গে বেরোতে হবে। গাড়ির চাবিটা নিয়ে আয়। যখন তখন পুলিশ চলে আসতে পারে এখানে।

-সুদীপ গাড়ির চাবিটা আমার হাত থেকে নিয়ে গাড়িটা তড়াতাড়ি বার করে অন্য রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো। আমার কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর তার সঙ্গে নিজেরটাও। তারপর আর দুটো নতুন ফোন বার করে আমাকে দিলো সঙ্গে দুটো নতুন সিম কার্ড।

-নে নতুন সিম কার্ড দুটো লাগিয়ে নে। (একটু স্বস্তিরনিঃশ্বাস ছেড়ে সুদীপ বলল) আপাতত পুলিশের হাত থেকে কিছু সময় দূরে থাকা যাবে।

-কি হচ্ছে কি সুদীপ, আমাকে না বলে ফোনটা ফেলে দিলি কেনো? ফোনটা তে কত দরকারি জিনিসপত্র আছে জানিস?

-আসলে পুলিশ আমাদের জিপিএসের মাধ্যমে না ধরতে পারে তার জন্যই এসব করলাম আর কি।

এরপর আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে বললো,

-তাহলে শোন ওই ম্যানেজারকে আমি গুল্লা ভাড়া করিয়ে হত্যা করিয়েছি। তবে ভাবতে পারেনি ধরা পড়ে যাবে ওই শালা হুতুম টা। আমার কথা বলার আগে আবার আমাকে বলল, জানি অনেক প্রশ্ন তোর মাথায় এখন নাড়া দিচ্ছে, তবে আর একটা স্কিং নিউজ দিই তাহলে-ওই মাঝিটা যাকে তুই মন থেকে একটু বেশিই ভালবাসিস। ওটা আর কেউ না, ওটা আমারই বাবা। বিষয়টা তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার করি তোকে,

শোন তবে-আমার না কারো আন্ডারে কাজ করে পোষাচ্ছিল না। বস, ম্যানেজার কি চোখে আমাদের দেখে বলতো? কাজ ঠিক করে করলেও দোষ আর একটু এদিক ওদিক হলে, তাহলে তো কোন কথাই নেই। তাই আমি ভাবলাম নিজের বিজনেস নিজেই খুলব। জানিস তো আমাদের অনেক জমি আছে। আর সেখান থেকে কিছু বিক্রি করে নিজের একটা বিজনেস এরিয়া তৈরি করব ভেবেছিলাম।

মনে আছে আমরা যে জমিতে গিয়েছিলাম ফ্ল্যাট বানাতে, ওই জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবা রাজি হলো না। তারপর দাদা ওই জমিতে নানা ধরনের গাছ, অনেক ফুল গাছ, তাছাড়া বিশেষ ধরনের কিসব গাছ লাগিয়েছিল। আসলে দাদা ওই জমিটা কোনরূপ মূল্যে ছাড়বে না, এমন জেদ ধরে বসে ছিল। অনেক বুঝিয়েছিলাম যখন কোন রূপে কাজ হলো না, তখন মাথায় একটা অন্য প্ল্যান এসে গেল। আমি পুরো জমিটার দলিলের কাগজ নকল করে ম্যানেজারকে দিই, আর অন্য একজনকে জমির মালিক সাজিয়ে নিয়ে যায়। তার আগে অবশ্য ম্যানেজারকে পুরো বিষয়টা আমি বুঝিয়ে বলেছিলাম, বুঝতেই

পারছিস ম্যানেজারও তেমন লোক ছিল। আমি দেখলাম এই কাজটা আমার থেকেও বেশি ম্যানেজার ভালো করবে। তারপর কোনরূপ জমিটা হাতিয়ে নেয়। বলতে পারিস আমার আর ম্যানেজারের অন্য লেভেলের প্ল্যান ছিল এটা। যাকে বলে, ছলে কৌশলে আদায়। আরে কথায় আছে না সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকাতে হয়, সেটারই একটু প্রয়োগ করেছি।

সবই ঠিকঠাক চলছিল, প্রবলেমটা হলো শেয়ারের ক্ষেত্রে। শেয়ারের প্রথম কথা ছিল আশি পারসেন্ট আর কুড়ি পারসেন্ট। মানে কিছু পরিমাণ টাকা আমার থেকে ম্যানেজারকে দিতে হবে। কিন্তু ম্যানেজার ব্যাটা পড়ে ফিফটি ফিফটি শেয়ারের কথা উল্লেখ করে বসলো। নকল কাগজ, তারপর আমার দাদার বারবার পুলিশ নিয়ে আসা, এইসব সব তো ম্যানেজার সামলেছে, সেই জন্য শেয়ার টা এত বেশি করেছে, এটা ম্যানেজার এর উক্তি। যাইহোক দাদার পাগল হয়ে যাওয়ার পিছনেও ঐ ম্যানেজারের হাত বলতে পারিস। তাবলে শেয়ার টা এত বেশি তা আমি মেনে নিতে রাজি হয়নি। সেক্ষেত্রে ম্যানেজার আমাকে রীতিমত ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে। তবে আমি কোন ভয় পাইনি কারন যদি ফেঁসে যায় আমি আর ম্যানেজার দুজনেই একসঙ্গে ফাঁসবো। তাই ওই বিষয়টাকে নিয়ে অতটা মাথা ঘামাইনি। কিন্তু সাইকো ম্যানেজার বাবাকে গিয়ে সব বলে দেয়। বাবা এসব শুনে যেমন হওয়ার, বুঝতেই তো পারছিস। মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপর উনি ও পাগলের মত হয়ে যায়। মানে পুরো পাগল নয়। তারপর ওই 7-8 বছর ওখানে থেকে মাঝির কাজ করে। হয়তো আমাকে চিনতে পারত, তবে না চেনার ভান করত। আর দাদাকে দেখেও খুব কষ্ট পেত। তবে আমাকে আর ছলে বলে পরিচয় দিত না। তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

এই কয়েকদিন মানে মাসখানেক আগে দাদা মারা যাওয়ার পর, আমার রাস্তাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যায়। জমির ব্যাপার ঠিক করে নিয়ে কাজ শুরু করতে গেলে আবার ম্যানেজার পিছনে লাগে। তারপর মাথায় আরো একটা বুদ্ধি খেলে যায়। পথের কাঁটা বাবা, তাকে সরিয়ে দিতে পারলেই সব আমার। তারপর সময়মত ম্যানেজারকে দেখে নেওয়া যাবে। তোর কাছে মাঝি মানে বাবার অসুখের কথা শুনতে পেয়ে আমিও পেটের ব্যথার নাটক করে হসপিটালে গেলাম। লক্ষ্য করলাম বাবা আমার পাশের রুমেই ছিল। জ্ঞান ফিরতে দেখি তোর সঙ্গে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে। তারপর আমি পথের কাঁটা কে সরিয়ে দিই। তারপর কিছু ভাড়াটে গুন্ডাকে দিয়ে ম্যানেজারের ব্যাপারটা -----

-কথা শেষ করার আগে বললাম, ছি ছি ছি তুই এত নিচে নামতে পারিস। ছি ছি তুই মানুষের পর্যায়ে পড়িস? এর থেকে জন্তু জানোয়ারেরাও..... আমার তোকে বলার মতো কোন ভাষা নেই এখন।

- জানি এখন অনেক কিছু মনে হবে তোর। তুই সরল প্রকৃতির মানুষ, তোর এসব সহ্য হবে না। তাই আমি এসব ব্যাপার তোকে আগে কোনদিন বলিনি। আজ পরিস্থিতির চাপে বলতে হল। আর যখন সবই শুনে ফেলেছিস, তাহলে আজকেই তোর অন্তিম রাত মনে করে নে।

-বলে সুদীপ দেখি একটা পিস্তল বার করেছে তার ব্যাগের মধ্যে থেকে। যার নিজের বাবাকে হত্যা করতে একটু কষ্ট হয়নি, তার আমার মত বন্ধুকে মারতে কোনরূপ কষ্ট হবে না, সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই কোনরূপ কথা না বলে চুপ করে বসে থাকলাম-যেন মৃত্যুকে একদম কাছ থেকে দেখার অপেক্ষা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মূহুর্তের মধ্যে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরে গেল। গাড়িটা কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বড় ধাক্কা। তারপর চারিদিক অন্ধকার। একটা গোধরা নিস্তব্ধ শব্দ।

জ্ঞান ফিরতে দেখি হসপিটালের বেডে শুয়ে আছি। নার্স পাশে বসে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডাক দিলেন। ডাক্তার এসে বলল, যাই হোক একজন কে তো বাঁচাতে সক্ষম হলাম। আরেকটা নার্স এসে ডাক্তার কে ডেকে নিয়ে গেল। বুঝলাম সুদীপের মৃত্যু হয়েছে। তবে কষ্ট হলো না একটুও। এরকম মহাপাপীষ্ট নিষ্ঠুর মানুষও পৃথিবীতে থাকে। কষ্ট একটু হল বেচারি মাঝির কথা ভেবে। গাড়ি এক্সিডেন্ট না হলে হয়তো আমার অবস্থাও মাঝির মত হত। অনেকক্ষণ একা একা বসে আছি, তবে গাড়ি এক্সিডেন্ট হল কিভাবে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি মাথায় হাত দিয়ে কে ডাকে। পিছনে তাকাতেই দেখি সেই মাঝি।

-বলেছিলাম না আমার সঙ্গে যারা এমন করবে তাদের কোনদিনও ভালো হবে না, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে
ওঠো,

-বলে ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল মাঝি.....



---3D Painting by Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics

উড়ন্ত মানব

সুপ্রতীক অধিকারী, ফ্যাকাল্টি

সেদিন মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি। চারিদিকে ভোরের পাখির কলরব। সোনালি হলদে রোদ্দুরে মাথা সবুজ আমগাছের সারিগুলো ছাড়িয়ে, ক্যাম্পের মাঠের কাছে গগনদার চায়ের দোকানে বসলাম। ঘুম ঘুম ভাব তখনও কাটেনি। একটু দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার পটলদা তার ছেলেকে কি একটা শেখানোর চেষ্টা করছে। কি মনে হল কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম পটলদা এবার সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। ছেলেটা পাখির মতো দুহাত মেলে পুরো মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে, মাঝে মধ্যে লাফিয়ে ওড়ার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হচ্ছে এসব পটলদা!

--“ছেলেটাকে উড়তে শেখাচ্ছি।”

অদ্ভুত তো! উড়তে শেখাচ্ছ মানে! মানুষ এভাবে উড়তে পারে নাকি। ডানা আছে নাকি!

--“ডানাটাই তো তৈরী করার চেষ্টা করছি।”

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ছেলেটা সত্যিই আপ্রান চেষ্টা করে হাতদুটো নাড়ছে আর ছুটছে হাঁফাচ্ছে। হাতের পরিবর্তে ডানা থাকলে এতোক্ষন বোধহয় সত্যিই উড়ে যেত মাঝ আকাশে।

আমি বললাম, এসব পাগলামি বন্ধ করো পটলদা। ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি।

অবশেষে কিছুক্ষণ পর পটলদা ঘড়ি দেখে নিয়ে ছেলেটাকে বলল

“Ok পুঁটু। চলে আয়। আজকের মতো ট্রেনিং কম্পিউটার।”

আমিও চলেই আসব, কি মনে হল জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পটলদা, এভাবে কি আদৌ তোমার ছেলে উড়তে পারবে? তুমি তো যথেষ্ট শিক্ষিত! তবে কেন দুদিন পরপর এসব উদ্ভট পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাও। পাড়ার লোকেও তো হাসে! পটলদা তখন এমন একটা কথা বলল, যা না বললে আমার এ গল্প লেখা হতনা। পটলদা বলল, “শোনো প্রতীক, এর পেছনে একটা যুক্তি আছে। জোরালো যুক্তি। তোমাকে বোঝাতে হলে সময় লাগবে। এসো গগনদার চায়ের দোকানে বসি, তারপর বলছি।”

পটলদার যুক্তিসমূহ শোনার আগে কিছু বিষয় খুলে বলি। লোকটার নাম পটল কুমার জোয়ারদার। আমাদের পাড়ায় উনি একজন হাতুরে সায়েন্টিস্ট হিসেবেই বেশী পরিচিত। তার নিজস্ব একটা ল্যাবও আছে। শুনেছি লোকটা আগে দিল্লিতে না কোথায় যেন কিছু একটা চাকরি করত। বছর সাতেক আগে চাকরি ছেড়ে আমাদের পাড়ায় এসে ঘাঁটি গেড়েছে। চাকরি বাকরি না করলেও লোকটা যথেষ্ট ধনী। লোকটার বয়স 45 এর ওপর। শোনা যায় লোকটার ওয়াইফ নাকি কি একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় বেশ কিছু বছর আগে। থাকার মধ্যে একটা ছোটো ছেলে। বছর দশেক বয়স। নাম পুঁটু।

পটলদা বেঞ্চে বসল। তারপাশে পুঁটু। তার গল্প শুরু করল।

“কিছুদিন আগে একটা কলেজের সায়েন্স ম্যাগাজীন পড়ছিলাম, ওতে একটা গাঁজাখুরি গল্প দেখলাম। সেই থেকেই আইডিয়াটা মাথায় এলো! আচ্ছা প্রতীক তুমি তো একটা কলেজে পড়াও শুনেছি, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো? বলোতো দেখি,

১. পৃথিবীর সর্বকৃষ্ট কম্পিউটার কে তৈরী করেন, কতো সালে?
২. বর্তমান পৃথিবীতে সেই কম্পিউটার কতোগুলি রয়েছে।
৩. সর্বপ্রথম 500 মেগা পিক্সেলের বেশী ক্ষমতার ক্যামেরা কে তৈরী করেছিলেন কতোসালে?”

একসাথে এতোগুলো প্রশ্ন শুনে মাথাটা গুলিয়ে গেল। ওদিক থেকে চাওয়ালা গগনদা ফোড়ন কাটল,
"এসব ওনাকে জিজ্ঞেস না করে সরাসরি গুগল সার্চ করলেই তো পারেন দাদা।"

পটলদা নির্বিকারে বলে চললেন,

"গুগল খুঁজে লাভ নেই। কেননা আমি একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহারই করিনি। আর সে শব্দটা ইউজ করলে গুগল কেন কোথাওই উত্তরগুলো খুঁজে পাবেনা। খোঁজার চেষ্টাও আর থাকবেনা। কারন এগুলো সবই তোমার জানা কিম্বা ধরো ইন্টারনেটেরও অজানা। কম্পিউটার, ক্যামেরা এগুলোর আগে 'বায়োলজিক্যাল' শব্দটি বসিয়ে নাও।"

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বুঝলাম, ব্যাপারটাতো বেশ ইন্টারেস্টিং।

পটলদা বললেন, "উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো। তুমি যার সাহায্যে এই কথাগুলো শুনছো ভাবছো চিন্তা করছো সেটাই হল সেই সর্বোকৃষ্ট কম্পিউটার। বায়োলজিক্যাল কম্পিউটার। যা দিয়ে স্ক্যান করছো তা 576 মেগাপিক্সেলের দুটো ক্যামেরা। অর্থাৎ মানুষের চোখ আমাদের ফোনের 48 মেগাপিক্সেল ক্যামেরাটার চেয়েও অনেক উন্নত।"

হা করে পটলদার দিকে তাকিয়ে আছি।

"কিন্তু প্রতীক, উত্তর তো পাওয়া গেল না। কে তৈরী করেছিল এসব? কোন ল্যাবে তৈরী হয়েছিল? তুমি বলবে ভগবান তৈরী করেছেন বহুদিন ধরে। কিম্বা বলবে এমনিই তৈরী হয়েছে টেনে আনবে ডারউইনের বিবর্তনবাদ। কিছুই ভুল নয়। ভগবান তো সবই তৈরী করেছেন। আমার এই মোবাইলটাও ভগবান তৈরী করেছেন কিন্তু কাজে লেগেছে মানুষের বুদ্ধি, দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মধ্যে দিয়ে এটা তৈরী। তাহলে মানব মস্তিষ্কটি কার মাধ্যমে তৈরী হল? আচ্ছা মানব মস্তিষ্ক বাদই দিলাম, পৃথিবীতে এতো কুকুর, তাদের মস্তিষ্কগুলো কে তৈরী করল কোন ল্যাবে তৈরী হল এতো দামি দামি কম্পিউটার গুলো?"

পটলদা থামলেন। পাশেই একটা কুকুর মাটিতে পড়ে থাকা বিস্কুটের টুকরো চাটছিল। একবার মুখ তুলে চাইল। তখনই আমার ভয়ানক হাসি পেল। আটকাতেও পারলাম না।

পটলদা বলে চললেন, "হেসে লাভ নেই প্রতীক, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা সকলেই জানি, কিন্তু খেয়াল করিনা। দীর্ঘদিন ধরে নিজের ওপরেই নিজে গবেষণা করে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানসাধনা করে চলেছে। তাদের কোনো পরীক্ষাগার নেই। আছে শুধু একটি অবচেতন মন আর বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা।

যদি ভেবে দেখা যায় একটা ছোটো মশাও একটা অনেক বড়ো বিজ্ঞানী যে লক্ষ বছর আগে প্লেন আবিষ্কার করেছে এবং তার ডিজাইন বংশানুক্রমে প্রবাহিত করে চলেছে। একটি মানব শুক্রানু মানবশরীরের সমস্ত ডিজাইন এবং তথ্য লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখছে। প্রত্যেকটা মানুষের দীর্ঘ ষাট বছরের গড় জীবনকালের অভিজ্ঞতা নতুন করে লিখে নিচ্ছে।"

আমার হাসি উবে গেল। দেখলাম গগনদাও চা ঢালতে ঢালতে মন দিয়ে শুনছে।

পটলদা বলে চললেন, "যেকোনো প্রাণীর শুক্রানু বা ডিম্বাণুই হল সবচেয়ে পুরোনো পুঁথি। দীর্ঘকালের অবচেতন মনের গবেষণায় সেগুলো হল বই। এক জনমের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মে যেতে পারে ওই ডিজাইন অনুযায়ীই। কিন্তু বর্তমান কয়েকশতক ধরে মানবজাতি যে বিজ্ঞান চর্চা করে চলেছে সেটা অনেকটা সচেতন মনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এবার তুমিই বলো কার জোর বেশী? সচেতন না অবচেতন? অবশ্যই অবচেতন। নইলে পৃথিবীময় এতো জটিল মস্তিষ্ক গুলো তৈরী হল কিভাবে! মানছি সে গুলো তৈরীতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে। কিন্তু তৈরী তো হয়েছে।"

পটলদা একটু থামলেন। এতক্ষণে আমার কপালে একটু চিন্তার ভাঁজ তৈরী হয়েছে।

পটলদা আবার শুরু করলেন, "এবার বলোতো পাখি ডানামেলে উড়তে পারে; অথচ মানুষ পারেনা কেন!" আমি একটু বিষম খেয়ে বললাম, ইয়ে, মানে পাখির তো ডানা আছে তাই পারে। মানুষ ও তো পারে। ওই যে এরোপ্লেনে উড়েছে...

মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে পটলদা বলে চললেন, "হ্যাঁ। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে উড়েছে আর প্লেন ক্র্যাশ হয়ে মরেও যাচ্ছে! তুমি বলোতো প্রতীক মানুষ কি পঙ্খ নয়!"

আমি স্তম্ভিত! চা ওয়ালাও স্তম্ভিত। যাই হোক পটলদা আবার শুরু করলেন, "বছর পাঁচেক আগে একটা প্লেন ক্র্যাশে আমার ওয়াইফ রঞ্জনাও এভাবেই চলে যায়। কি অদ্ভুত ভাবো! আমি তখন সেই এয়ারপোর্টেই। ল্যান্ডিং এর ট্রাফিক কন্ট্রোলারের চাকরি করতাম নেদারল্যান্ডসে। এয়ারপোর্টে নামার আগে দুশো যাত্রীকে চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখলাম। ল্যান্ডিং মিনিট খানেক আগে একটা ছোটো পাখির সাথে সামান্য টাচ। সাইড প্লেটে আগুন। যাইহোক রঞ্জনার চলে যাওয়ার পর ছেলেটাকে নিয়ে এখানে চলে আসি। দেশের বাড়ি বলে কথা। পূর্বপুরুষের টান। যে কথাটা বলছিলাম সেদিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আগুন লেগে যাওয়া প্লেনটার ধংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকলাম। দেখলাম তখন ও পাখিগুলো উড়ে চলেছে। কই ওরা তো কখনও ক্র্যাশ করেনা। সুতরাং ওদের বিজ্ঞান অনেক উন্নত। ওদের কাছে মানুষ তো পঙ্খ প্রজাতি"।

আমি এবং চা ওয়ালা দুজনেই মন দিয়ে গল্পটা শুনে চলেছি। পটলদা আবার শুরু করলেন, "তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। রোজ ভাবি, কেন মানবজাতি এতো দুর্বল! উত্তর পেলাম এই সেদিনের একটা ম্যাগাজীনে কি একটা কলেজের কোন বিজ্ঞান বিভাগ বোধহয়। আসল কথাটা কি জানো প্রতীক, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পাখিরও ডানা ছিলনা। পৃথিবীর সব প্রাণী তো একসময় এককোশীই ছিল তাইনা? প্রথমে এলো উদ্ভিদ।পরে প্রাণী। কিছু প্রাণী চেষ্টা করল ওড়ার। লক্ষ বছর ধরে চেষ্টা করতে করতে বংশানুক্রমে এতোদিন পর দুটো ডানা তৈরী হল তাদের। আর কিছু প্রাণী চেষ্টা করল বুদ্ধি দিয়ে বাঁচার। তারাই মানুষ। যদি তারাও ওড়ার চেষ্টা করত তাদের ও নিশ্চয়ই আজ দুটো ডানা থাকতো। থাকতো না? "

পটলদা আমার দিকে প্রশ্নের চোখে তাকালেন। আমি খাবি খেয়ে বললাম, হ্যাঁ থাকত। চা ওয়ালাও বলল, "থাকত"।

পটলদা আবার শুরু করলেন, "সুতরাং আমার ছেলে যদি এখন থেকে ওড়ার চেষ্টা শুরু করে এবং ওর উত্তরাধিকারীরাও প্রত্যেকেই সেই চেষ্টা করতে শুরু করে তাহলে ওর পাঁচশ কি হাজারটা জেনারেশন পরে হাত দুটো বদলে ডানা হয়ে যাবে না কি?"

আরেকটু হলেই বেঞ্চ উলটে কুকুরটার ঘাড়ে চিৎপাত হতাম। কোনোমতে সামলে নিলাম।
পটলদা আমাদের দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বললেন, "কি হল কথাগুলো কি যুক্তিহীন বললাম?
চা ওয়ালা ভ্যাচাচ্যাকা খেয়ে বলল, "একদম ঠিক বলেছেন।"

পটলদা বললেন, "হ্যাঁ। আমি ভেবে রেখেছি ছেলেকে শিখিয়ে রেখে যাব, ওর ছেলে এবং তার ছেলে কিম্বা
মেয়ে যেই হোক এভাবে বংশ পরম্পরায় প্রত্যেকেই যেন রোজ সকালে ঘন্টাখানেক ওড়ার চেষ্টা করে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর পর আমার ফ্যামেলিতে ডানা গজাবেই।"

এসব বলতে বলতে পটলদা আর পুঁটু মিলে দু প্লেট এগটোষ্ট আর দু কাপ চা আর ছ-সাতটা বিস্কুট কখন
পেটে পুড়ে দিয়েছেন আমরা লক্ষ্য করিনি। বললেন, "আচ্ছা উঠি এখন প্রতীক, আমার বিলটা তুমি একটু
দিয়ে দিও, খুচরো নেই কাছে। চল পুঁটু তোর প্রাইভেট টিউশনের টাইম হল।"

আমি পিছু ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "পটল দা, আপনি কোন ম্যাগাজীন থেকে এসব আইডিয়া পেয়েছেন?
একটু বলবেন?"

পটলদা একটু ভেবে চিন্তে জানালেন, "কি যেন নাম কলেজটার, হ্যাঁ মনে পড়েছে, শ্রীকৃষ্ণ কলেজের কোন
একটা বিভাগ যেন, পদার্থবিজ্ঞান সম্ভবত।"

এবার সত্যিই উল্টে পড়ার জোগার, পড়লাম ও তাই। কুকুরটা কাঁক করে উঠে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে গেল।

গগনদা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে তড়িঘড়ি উঠিয়ে বেঞ্চে বসিয়ে বলল, "কি ব্যাপার প্রতীক,
রাতে ঠিকমতো ঘুমাওনি নাকি! এই নাও চা, কখন থেকে দেখছি ঝিমোচ্ছ। মিনিট পাঁচেক আগে দেখলাম
বাঁশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছ। আমি আর ডাকলাম না! কে জানত এভাবে উলটে পড়বে!"

আমি চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে পটলদাকে খুঁজলাম, পটলদা! পুঁটু ওরা কোথায় গেল!
গগনদা অবাক হয়ে বলল, "কি সব বলছ। পটলদা আবার এখানে আসবে কোথা থেকে।"

বুঝলাম চায়ের দোকানে বসে একটা বিচ্ছিরি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি। তারপর কুকুরটার দিকে চোখ গেল! সত্যিই
তো এই নেড়ি কুকুরের ব্রেনটা কিভাবে তৈরী হল! লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কুকুর নিজেই তো এটা বানিয়েছে!
কুকুর কিকরে এতোবড়ো বিজ্ঞানী হতে পারে! তারপরই বাড়ি ফেরার পথে লক্ষ করলাম একটা লাউ গাছ
বড়ো বড়ো আঁকশি দিয়ে কি একটা অবলম্বন ধরে একটা বাড়ির ছাদে উঠে চলেছে। লাউ গাছের কি চোখ
আছে! এতো বিজ্ঞান জানলো কোথা থেকে!

মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল, দেখেছ প্রতীক পৃথিবীর প্রথম সোলার এনার্জী প্লেট --গাছের পাতা!



Infopic

One of the residents of Physics Department during the COVID-19 Lockdown period. These residents have taken care of the physics laboratories by galvanizing the instruments with their sticky-white bio-waste ensuring no external dust is in contact with the instruments!

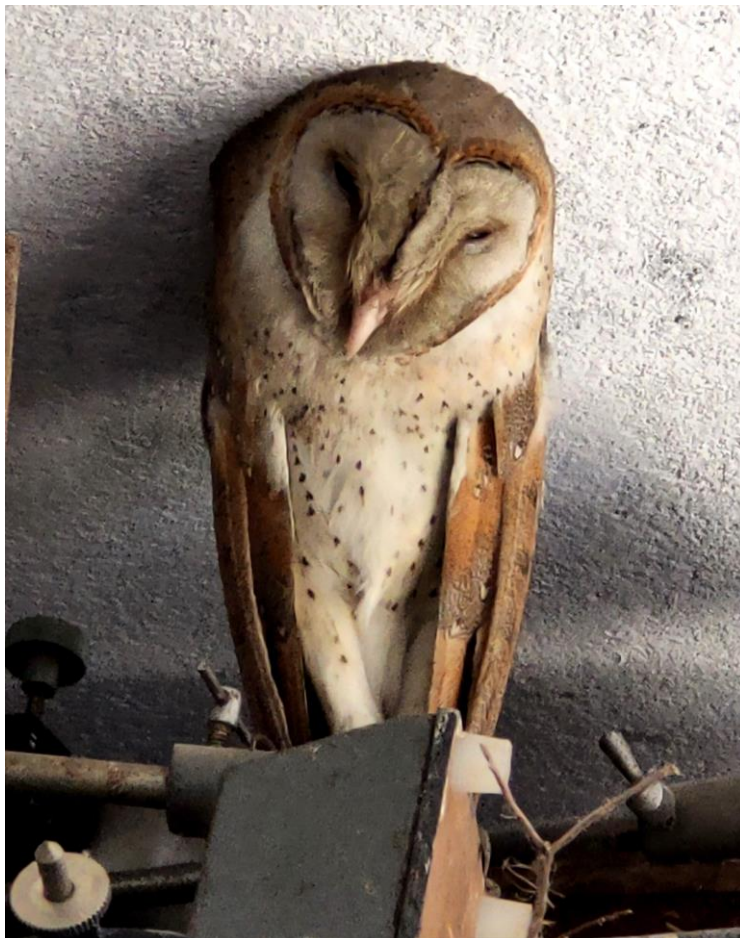


Photo was captured using Mobile Camera.

This is a female **Indian Barn Owl or Barn Owl** (*Tyto alba*). The male Barn Owl is whiter from face to the abdomen. It is also known as white owl. The barn owl is found almost throughout the world except in polar and desert regions. Generally, they hunt during the night, and they can eat up to 4-5 small mammals (like rats, bats) each day. They hunt using their acute sense of sound. They fly **low and silently** to catch the **faint sound** caused by the movement of the small mammals. The shape of the face helps to receive more sound waves, you can think of their face as '**dish antenna**' to receive acute sound. The bill is curved downwards to maximize the surface area of the 'dish' and to have a clear field of vision. The female and the young depend on the male for food. The prey is eaten full, fur and bones are coughed up as an Owl pellet. The average life span of this Owl is around four years. Females are heavier than the male of the species.

Dr. Sujay Pal
Department of Physics

আমারও নিজস্ব ভূমি আছে

অন্তু বিশ্বাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

হতাশা আমার প্রিয়তমার মতো
ভালোবেসে চলেছি তারে অবিরাম!
আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো:
গন্তব্য কোথায়?
কোথা থেকে আসছি?
বলবো, জানি না!

আমার চোখ দিয়ে তোমরা কিছুই দ্যাখো নি;
তোমাদের কথাগুলো সত্যিই আমার কাছে
একই ছাঁচে তৈরি কতকগুলো মূর্তি বিশেষ!
বেঁচে আছি শুধু:
অথচ উপত্যকা ধরে হাটিনি কোনোদিন
তিস্তার উৎস সন্ধান?

কোনো এক প্রত্যুষে আমার জন্ম হয়েছিল;
সেদিন কেউ আমাকে বলে নি:
এখানকার নির্মমতা!
এখানকার বিভৎসতা!
আমার মতো অবিকল যারা
তারা কতটা ভয়ানক হতে পারে?

তাই স্বপ্নে স্বপ্নে বেড়ে উঠে দেখি,
রক্ষতা চতুর্দিক;

আমার একান্ত নিজস্ব ভূমি আছে যদিও
সেখানে কোনো ফসল হয় না!
সারাটা বর্ষা গেলেও
এক ফোঁটা বৃষ্টি নামে নি!

Unemployment

Sayan Karmakar

6th Semester, B.Sc. Programme

The fog of the dawn of my spring
Has become innocent nicotine
For your bright sunshine
And spread in the heaven
Of twilight of employment!

The elegance of your love
And pleasure of parlance
Arose a insanity in every artery
In my breathing, in my credence.

Now, it may be opaque night!
Don't want the day light
And any perplexity of VIBGYOR.

I just want to be the SUN in your shadow
Beyond of your existence.



--by Partha
Biswas, 1st
Semester,
B.Sc.
Programme

সৃষ্টি

সায়ন কর্মকার, বিএসসি প্রোগ্রাম, ষষ্ঠ সেমিস্টার

যতই ছেয়েছিলাম যেতে গভীরে,
সৃষ্টির তরঙ্গরা আছরে এনে ফেলেছিল আবার
সেই কূলে!
বিনিদ্র রাতে টুপটাপ বৃষ্টির শব্দে
নিস্তন্ধতা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তারই কাছে।
ধোঁয়াশা গুলো সরিয়ে যখন দেখেছিলাম
গোধূলীর অভিমান-
সত্যি কথা বলতে কি!
সেদিনই ভুলে গিয়েছিলাম, সৃষ্টির মহা শক্তি কে
করতে প্রণাম।
বন-তুলসীর পাতার নীচে লুকিয়ে থাকা
মাকড়সার ডিম,
আর মাটি খোঁরা নিরীহ কেঁচোর স্নিগ্ধতা -
চোখে পড়েছিল না সেই দিন!
প্রকৃতিতে কেবল দেখেছিলাম শিউলী পাতায়
শিশির ফোঁটা,
মাঝে মাঝে অবশ্য সঙ্গী ছিল আনন্দ আর কিছু
নীরব ব্যথা।
বসন্তের শুকনো পাতায় হেঁটেছিলাম,
বুঝেছিলাম এটা সূচনা নয়! অস্তিম!
তাই পাতা গুলো সব জড়ো করে আগুন
দিয়েছিলাম;
সেদিনই ওরা জ্বলেছিল, জ্বলেপুড়ে ছাই হয়েছিল!
আজও সেই ছায়ের গাদাই শুয়ে থাকা কুকুরের
আত্মবিলাপের ঘুম,
আর, পাথরের বুক চিড়ে বেড়ে ওঠা দূর্বা ঘাসের
ছোট ছোট ফুল -
আমাকে একলা করেছে, থেকেছি নিজঝুম!
সেদিনই চেয়েছিলাম মল্লয়ার দেশ!
ধুং, এসব যতো উড়ো স্বপ্ন, গরম রক্তের রেষ।

কিন্তু আমি জানি,
ওরা এখনও জীবিত আছে,
পোড়া ছাই হয়ে বা কঙ্কাল হয়ে, গভীরে আরো
গভীরে!
যেখানে সমুদ্রের ঢেউ গুলো সব এক হয়েছে,
সব শান্ত হয়েছে।
সময়ের চোরা বালির আলতো ছোঁয়ায়,
কে জানে কোন চুলোয়-
ওরা সব লুকিয়ে আছে।
তবুও, ওরা এখনও জীবিত আছে,
যেমন করে-
“তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে”
কিন্তু সে তালগাছ আজ কে জানে কোন কূলে,
হইতো বা নিস্তন্ধ প্রান্তের মেঘ গর্জনের ডাকে
চরম সত্য কে ভেঙে চাতকের মতো চেয়ে
আছে-
যুগ যুগ ধরে!
ওদের রক্তে এখনও সুর ভেসে আসে।
তবুও বিবেকের ডাকে সময় সত্য কে ডেকে
আনে!
আর,
মাঝে মাঝে মনে হয়,
সূর্যটাকে একটা বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিই,
ঘড়ির ব্যাটারি টা খুলে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে
নিই!
তবুও কী জেগে থাকবো দিনের সাত রঙের
জটিলতার উর্ধ্বে উঠে-
গভীরে আরো গভীরে?



সাম্প্রতিক

শ্রেয়সী বিশ্বাস,
৪র্থ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

আজিকে শ্রাবণ
করিছে বর্ষণ
ক্লান্ত ধরণীয়ে
সজীব করিতে,
জুড়ি মেলা ভার।
শত শত কোটি মানুষ কাঁদে
বাঁচিবার লাগি শুধু মনে-প্রাণে,
জনজীবন আজ স্তব্ধ
করোনা করিছে রুদ্ধ।
ভাবনা নাই চিন্তা নাই,
হয়তো বা আছে সবই,
তাইতো ভাইরাস আজ হয়েছে মারন,
শুনিবে না কারো বারণ!
রোগ-ব্যাদি-জরাগ্রস্ত মানুষ,
দিন গোনে শুধু
বাঁচিবার আশে;
বাঁচিবে না কী তারা প্রাণে?
যেদিন ধরণী হইবে মুক্ত--
হইতে সমস্ত গ্লানি কলুষতা;
যেদিন হয়তো হইবো সিন্ত।
স্নিগ্ধ আলোর রিক্ততা
করিব কেমনে ব্যক্ত?
যতদিন ধড়ে আছে এ প্রাণ,
করিব না ভয়ডর,
চলেছি মোরা একসাথে
চলিতে থাকিব।।

নব-বরষা

সুপ্রতীক অধিকারী, ফ্যাকাল্টি

বরষা নামিলো আজি
বর্ষ ঘুরিয়া শেষে
ঝরিছে শীতল বারি
ঝরনা ধারার বেশে,
দ্বিধাহীনা প্রকৃতির
দক্ষ শরীরখানি
জুরাইলো শান্তির
তরল আশীষ মানি,
আজিকে গগনে নাই
আলোর সে ঘনঘোর
নাই স্ফোভ, সুখের এই
কলঙ্কে সে বিভোর,
আজিকে শীতল রাতে
প্রকৃতির অভিসার
গগনের আশীর্বাদে
তরুপল্লবে তার
ভরিবে স্নেহের ডালি
আরো এক বরষে
ঘুচিবে সকল দুখ
কিশলয় হরষে।।



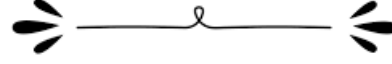
অনুযোগ

শ্রেয়সী বিশ্বাস

৪র্থ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

আজ এখানে, কাল সেখানে
হয়েছে কী তোর বল?
থাকবি যদি নাই ভেবেছিস --
যাসনা কেন চলে!
বিদীর্ণ হিয়ার বাঁধন খুলে,
পর্দাখানা তুলে,
ভুললি কেন আমায় ওরে --
পাষণ হৃদয় মানিকরে।
কাল ভুলিয়ে গেলিই যদি--
বলিলিনে কেন আসি?
জড়িয়ে তো খুব ধরেছিলি নিটোল বাহুপাশে
ছেড়ে যখন চলে গেলি পড়ল না তোর মনে।
পথের পানে তোর চেয়ে চেয়ে চোখ গেল যে
জুড়ি।
মনে পড়ে এক প্রভাতকালে আধ ফোটা
রজনীগন্ধার কুঁড়ি,
শীতের পরশ, হিমেল হাওয়া;
পাখির নীড় ছাওয়া,
গা ম্যাজম্যাজ সারাটা দুপুর,
পানা ভরা এক/রোদ ঝলমলে পুকুর।
হঠাৎ বৃষ্টি এল ঝামঝামিয়ে,
হাসনুহানার তীব্র গন্ধ মাখিয়ে,
নদীতীরে গেল নিয়ে।
হাওয়ায় ছায়ায়
দোদুল দোলায়,
পড়ল নাকি মনে!
লুকোনো ছিল যে ব্যথা হৃদয়ের এককোণে,
ভুলেই বুঝিবা গিয়েছিলেম--
হয়তো বা সে অভিমান।

যখন দেখি অবোধ শিশু খেলছে
তার আপন খেলগৃহে;
বুঝিলাম এই সেই বাচ্ছাধন--
যারে দিয়েছি আপন মন।
এত দিনে তার কাছে পাইলাম,
হাতে পাইলাম স্বর্গসুখ।
আশাদেবী আজ হইল মোহিত;
মনোরথ হইল পূর্ণ সমাহিত--
বসন্তদিনের বিহঙ্গ কলতানে,
হইল যে আজ মানভঞ্জন।।



সমাজচ্যুত বৃক্ষ

সুমন সাঁধুখা, ৪র্থ সেমিস্টার, ফিজিক্স অনার্স

সৃষ্টির বক্ষে তির বিঁধে
সুপ্তাবস্থা বিরাজকে জাগরিত করলাম
ক্লেশান্বিত ক্ষুদ্র জীবন গড়ে তুললাম।
অধিক কষ্টে হলেও ঠাই
টিকে থাকার অধিকার যে নাই,
বেঁচে থাকার উপাদান
যেন প্রকৃতির এক রূপদান।

তার উপর স্থান যেন এক অলীক কল্পনা
রসহীন পাথরের দীর্ঘ পরিচালনা,
তবুও আমার উপর বাটপারি হানে
নির্বুদ্ধি ছারপোকাকার দলেরা গণে গণে।

আমার প্রানবন্ত থাকা,
দৃষণ মুক্ত প্রকৃতির ছবি আঁকা,
যদিও আমি সর্বনাশের প্রতীক রূপে গণ্য নয়
তবুও আমি সর্বহারার ইশারায় চিহ্নিত হয়।।

স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা

সুস্মিতা রায়, ৪র্থ সেমিস্টার, বিএসসি
প্রোগ্রাম

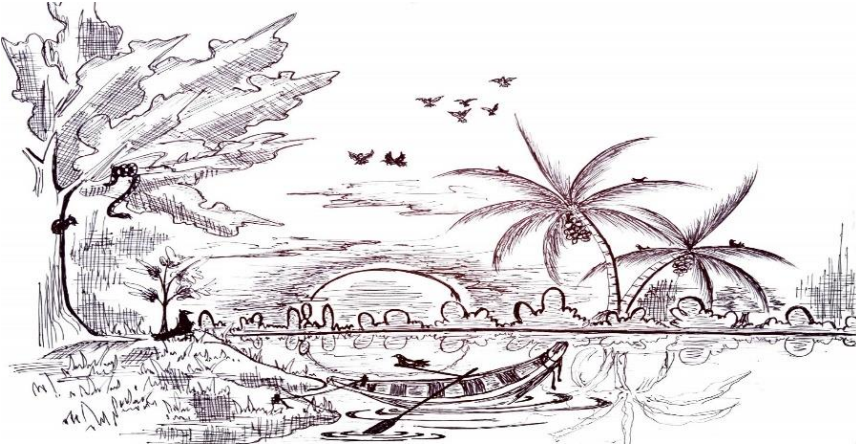
আমাদের এই ভারত বর্ষ
হচ্ছে দূষিত আজ,
করছে তাকে দূষিত
ভারতের জনগণ
চারিদিকে ভরে গেছে
নোংরা আবর্জনায়
সেই নোংরার কারণেই হচ্ছে অসুখ
ঘরে ঘরে সবার
প্রধানমন্ত্রীও দিয়েছেন ডাক
স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার
আমাদের দেশকে দূষণ থেকে বাঁচানো
আমাদেরই অধিকার
যেখানে সেখানে নোংরা ফেলার
অভ্যাসের করতে বিনাশ
স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত
চলো করি পরিষ্কার আমরা সবাই।
এসো আমরা হই মিলবদ্ধ
স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার,
আমরাই পারি ভারতবর্ষকে করতে
দূষণ থেকে প্রতিকার।।

Because it's life

Bidisha Sarkar

6th Semester, B.Sc. Programme

We all thought once in a life -
"Why pain always has to be mine?"
It's not true, it's not just you.
We all have been there, if just for few.
So, be brave and believe on you.
We thought- 'life is unfair to all of us'
that's not it, it's a wrong reflection.
You just can't always be there
in the sunshine, but not in fear;
you have to face all your guilt,
if you want to live your dream.
You just can't always be greedy,
but sometime you can be needy.
You have to cry and again you have to try.
So, that's it, don't ever fall,
life isn't big enough - not for this all.



----Sketch by Partha
Biswas, 1st Semester, B.Sc.
Programme

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের হাল হকিকত

Dr. Tushar Kanti Bose, Faculty, Department of Physics

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের কম্পিউটার গুলো যেকোনো আধুনিক সুপারকম্পিউটারের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী হবে। যদিও কোয়ান্টাম কম্পিউটার আসামাত্রই এখনকার কম্পিউটার গুলি অচল হয়ে পরবে না। কারণ তখনো বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার ব্যবহার করাই হবে সহজতর এবং সুলভতর উপায়। কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের প্রভাব হবে অভাবনীয়। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভাবনার চেষ্টা করছে। যেমন নতুন drug ডিজাইন করা অথবা ইলেকট্রিক গাড়ীর জন্য আরও শক্তিশালী ব্যাটারী তৈরী করা ইত্যাদি।

একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের প্রধান শক্তি হচ্ছে যে সেটা কোয়ান্টাম বিটগুলিকে সুপরিকল্পিত রূপে পরিচালনা করতে পারে। ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার (অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কম্পিউটার) গুলিও বিট ব্যবহার করে। এদের ক্ষেত্রে বিটগুলি হচ্ছে ইলেক্ট্রিক্যাল বা অপটিক্যাল পালস এর স্রোত। আমরা প্রতিনিয়ত যে ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, ইউটিউব ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করি সেগুলো সবই প্রকৃতপক্ষে 0 এবং 1 এর স্রোত। অন্যদিকে একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট গুলিকে ব্যবহার করে। এরা হল পরমাণুর তুলনায় ছোট আকারের কণা যেমন ফোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি। কিন্তু এই কিউবিট গুলিকে তৈরী করা এবং সফলভাবে পরিচালনা করা একটা বৈজ্ঞানিক এবং প্রায়ুক্তিক চ্যালেঞ্জ। IBM, Google, Rigetti Computing নামক কোম্পানিগুলি সুপারconducting সার্কিট কে চরম শীতল করে ব্যবহার করছে। অন্যান্য কিছু কোম্পানি যেমন Ion Q, একটি চরম শূন্য কক্ষে একটি সিলিকন চিপে পরমাণুদের সজ্জিত করছে। এই দুই আলাদা পদ্ধতিতেই আলাদা কিউবিটগুলোকে একটা নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম স্টেটে আটকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিউবিটদের “সুপারপজিশন” এবং “এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট” নামক দুটি আশ্চর্য ধর্ম আছে। সুপারপজিশন: কিউবিটগুলো একইসাথে 0 এবং 1 এর একাধিক কন্ট্রিনেশনকে প্রকাশ (represent) করতে পারবে। এই ঘটনা ঘটাবার জন্য কিউবিট গুলোকে লেসার বা মাইক্রোওয়েভ বিমের সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। এই সুপারপজিশন এর ফলেই একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার বিশাল সংখ্যক সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যেথেকে সঠিক উত্তরকে বেছে নিতে পারে। অন্তিম ফলাফল তখনই আসে যখন কিউবিটগুলোকে মাপা (measure) হয়। এর ফলে তাদের কোয়ান্টাম স্টেটটা 0 অথবা 1 এ চলে আসে। অন্যদিকে এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট শব্দটির মানে হল যে দুটি কিউবিট একটি নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম স্টেটে থাকবে এবং তাদের মধ্যে যেকোনো একটির স্টেট পরিবর্তন করা হলে একেবারে সাথে সাথেই অপরটির স্টেটও পরিবর্তন হবে। যদি ঐ দুই কিউবিটের মধ্যে দূরত্ব অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটে। তাই এই এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক। এটা এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকেও ধাঁধায় ফেলেছিল। তিনি এন্ট্যাঙ্গলমেন্টসম্পর্কে বলেছিলেন, “spooky action at a distance”. কিন্তু এই এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ব্যাপারটাই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের শক্তির পিছনে রয়েছে।

বর্তমানের কম্পিউটারগুলোতে বিটের সংখ্যা বাড়ানো হলে করলে কম্পিউটারের প্রসেসিং ক্ষমতাও কয়েকগুণ হয়ে যায়। কিন্তু কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট এর জন্য একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কিউবিটের সংখ্যা বাড়ানো হলে তার প্রসেসিং ক্ষমতা অনেকগুণ (exponentially) বৃদ্ধি পায়। একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার কত তাড়াতাড়ি কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করবে সেটা নির্ভর করে কোয়ান্টাম এলগোরিদম এর উপর।

কিউবিটগুলো তাদের পরিবেশের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারে। এই ইন্টারঅ্যাকশন এর ফলে তাদের কোয়ান্টাম ধর্ম ক্রমশ কমতে থাকে। এই ঘটনাকে ডিকোহেরেন্স বলে। কিউবিটের চারপাশের তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনও কিউবিটগুলোর পূর্বপরিকল্পিত সুপারপজিশনকে নষ্ট করতে পারে। এই কারণে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপায়ের (যেমন সুপারকুল্ড ফ্রিজ বা ভ্যাকুয়াম চেম্বার) মাধ্যমে ডিকোহেরেন্সের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছেন।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে আরও জানতে হলে এই লেখাগুলো পড়তে পার:

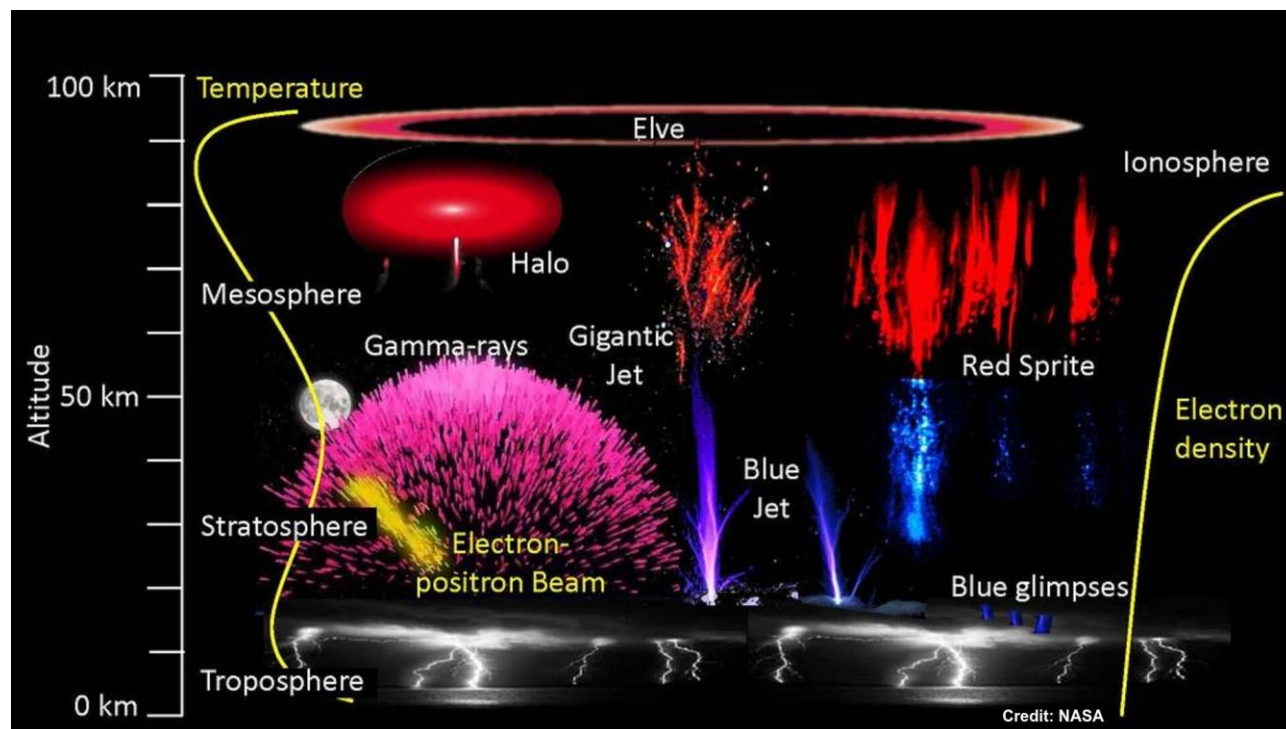
১) <https://bigyan.org.in/2018/02/28/quantum-computing-1/>

২) https://www.elebele.org/2020/12/blog-post_27.html

Hidden Side of Thunderstorm and Lightning

Dr. Sujay Pal, Faculty, Department of Physics

I am sharing a short story of some spectacular, colorful, and interesting phenomena associated with the thunderstorm and lightning activity, normally not seen in our naked eyes, known as **Transient Luminous Events (TLEs)**. The purpose is not to go through detail physical mechanisms and science objectives but just to introduce you to the hidden side of the thunderstorm and lightning activity.



Transient Luminous Events (TLEs)

What are TLEs?

Transient Luminous Events (TLEs) is the collective name of various short-lived optical phenomena occurring over a wide range of altitudes (15-110 km) from the stratosphere to lower ionosphere. TLEs include 'sprites', 'elves', 'blue jets', 'gigantic jets' etc. (See the image above). TLEs are also known as upper atmospheric lightning.

Discovery of TLEs:

Several pilots had reported of spectacular bright flashes in upper atmosphere throughout 20th century, but there was no solid proof or captured images. The first image of TLE of sprites was captured accidentally in 1989 by Professor John R. Winckler of the University of Minnesota when he aimed a low-light TV camera at the sky to film a rocket launch. Replaying the tape later on, he found brilliant columns of light extending from the tops of thunderclouds. NASA also immediately reviewed the video tapes taken from the space shuttle that looked at lightning events on Earth. They found dozens more examples of TLEs. Since then, several different types of TLEs have been

documented and classified by many researchers around the globe especially from the USA, Australia, Japan, Taiwan and Europe.

Sprite: Sprite is acronym for **S**tratosphere/mesosphere **P**erturbations **R**esulting from **I**ntense **T**hunderstorm **E**lectrification. It is the most common TLE attributed to the electrical breakdown of the mesosphere at 40-90 km altitude. It appears as weak luminous flashes directly above an active thunderstorm. Most of the time Sprite is found with powerful positive cloud-to-ground lightning strokes. Sprites are mostly red, and they usually last for few milliseconds (~2-3 ms). Their shape can be resembled with jellyfish, carrot or column (See the image).

Elves: Elves is acronym for **E**missions of **L**ight and **V**ery **L**ow Frequency **P**erturbations due to **E**lectromagnetic **P**ulse **S**ources. Elves are diffuse optical flashes with a duration of less than 1 ms. The horizontal scale of Elves can be 100 to 300 km and always occur after the onset of cloud-to-ground lightning (positive or negative) discharges but before the onset of sprites. They expand rapidly in a circular form (see the image) and are most likely occurred due to the energetic electromagnetic pulse (EMP) from lightning which propagates to the lower ionosphere and interacts with the electrons.

Blue Jets and Gigantic Jets: Blue jets are optical ejections from the top of the electrically active core regions of thunderstorms, but not directly associated with lightning. Gigantic jets are similar to blue jets but can reach up to 90 km high and are very rare.

How can TLEs be observed?

Sprites can be seen through dark-adapted eyes at night from distant location but in practical TLEs are photographed using high speed low-light sensitive cameras capable of capturing thousands of frames per second.

Dedicated Space Mission for TLEs

The European Space Agency Atmosphere-Space Interactions Monitor (**ASIM**) aboard the International Space Station (ISS) is in operation for monitoring of TLE events globally since April 2018. ASIM is a collection of optical cameras and photometers along with a X-ray and gamma ray detector that is used to detect the TLEs.

The much-awaited **TARANIS** (Tool for the Analysis of Radiation from lightning and Sprites) satellite mission of French Space Agency (CNES) for monitoring of TLEs was launched in November 2020, but the European Vega rocket failed after launch and the mission was lost.

Are TLEs visible in other planets?

Recently, sprites and elves have been observed dancing in the upper atmosphere of Jupiter captured by the NASA's Juno spacecraft in ultraviolet range (2020).

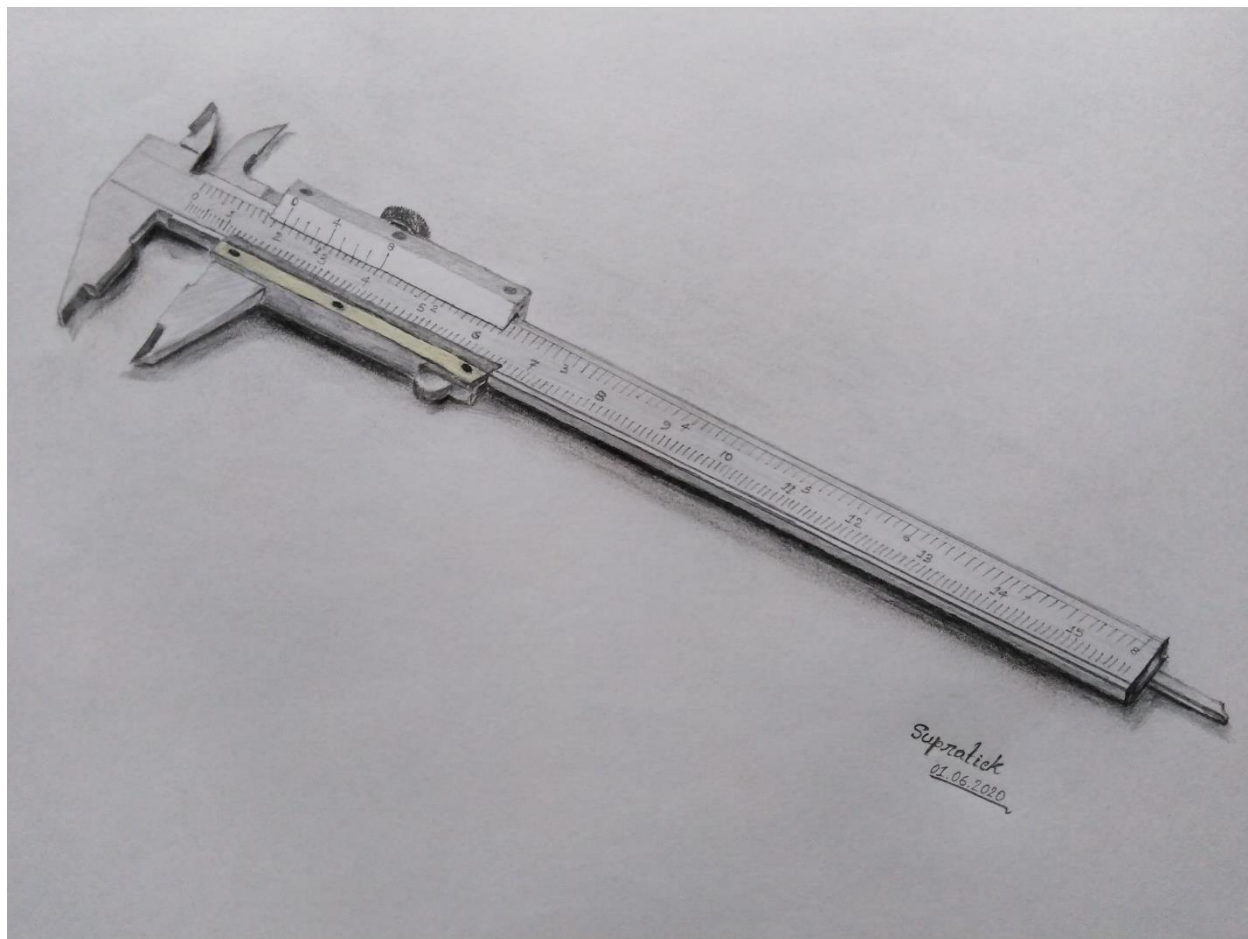
Can we detect TLEs?

Yes, our Physics Department is engaged in the process of installing several cameras and radio receivers at 5-6 places of West Bengal to detect and study the TLEs through a SERB research grant. Cheers!

For more details please visit:

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/Once_Upon_a_Time_in_a_Thunderstorm

https://vlf.stanford.edu/research_topic_inlin/transient-luminous-events



.....by Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics

BIG DATA AND OUR DAILY LIFE

Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics

The quantities, characters, or symbols on which operations are performed by a computer, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical, or mechanical recording media are known as DATA.

In this era, where every aspect of our day-to-day life is gadget oriented, every day billions of people interacting with their devices via the internet create a colossal amount of valuable data. Actually, we are generating a massive data daily by using social media app, by doing online shopping, by booking bus, train, flight tickets online, by streaming online music, movies, web-series, by chatting with friends in Whastapp and many more. In short, with each click, share, like, and swipe, the society is creating enormous data.¹ In 2003, the world had created a total of 1.8 zettabytes of data. In 2011, that same amount was created just in every two days.² In 2020, people created 1.7 megabytes of data per second i.e., 2.5 quintillion bytes of data every day.³ By 2025, the amount of data generated each day is expected to reach 463 exabytes globally.⁴ Google, Facebook, Microsoft, and Amazon store at least 1,200 petabytes of information. By 2030, nine out of every ten people aged six and above would be digitally active.⁴ So, the amount of data is increasing exponentially and it is observed that the volume of data is almost become double in every two years.



WHAT IS BIG DATA:

This huge collection of data, which is yet growing exponentially with time, is called BIG DATA. It is a data with so large size and complexity that none of traditional data management tools can store it or process it efficiently. Needless to say, data analysts have faced a lot of challenges in the analysis and study of such a huge volume of data with the traditional data processing tools.

BIG DATA TECHNOLOGY:

The BIG DATA TECHNOLOGIES are developed to analyse the huge data created by us daily. In these technologies some software tools are used for analysing, processing, and extracting data from an extremely complex and large data set with which traditional management tools can never deal. Top big data technologies are divided into four fields which are classified as **Data Storage** (Software like Hadoop, MongoDB are used to store large amount of data), **Data Mining** (Software like Presto, Rapid Miner search and produce suitable result from large chunk of data), **Data Analytics** (Software like Apache Kafka, Spark are used to analyse the data properly), **Data Visualization** (Software like Tableau, Plotly produce simple overview from the complex data).

The Big Data technologies can be categorized in two types: **Operational Big Data Technologies** and **Analytical Big Data Technologies**. The **Operational Big Data** is all about the normal day-to-

day data that we generate. In the cases of *Operational Big Data Technologies*, they include the data generated from online ticket bookings for movies, flights, railways, online shopping from Amazon, Flipkart, Paytm, Myntra, etc., newsfeed, chats, pictures of social media sites like Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, etc., the employee details of any multinational company. The *Analytical Big Data* is like the advanced version of Big Data Technologies. It is a little complex than the *Operational Big Data*. In short, *Analytical Big Data* is where the actual performance part comes into the picture and the crucial real-time business decisions are made by analysing the *Operational Big Data*. For examples, stock marketing, carrying out the space missions, weather forecast information, medical fields where a particular patients health status can be monitored.

EFFECTS OF BIG DATA IN OUR PERSONAL LIFE:

It is getting harder and harder to function in normal society without the presence of Big Data somehow in our life. It is no exaggeration to say that Big Data is everywhere today. Experts of all kinds are working to apply the knowledge gained from Big Data in an ever-growing number of ways. Companies and organizations are collecting information about their targeted audiences. They know what you are watching, what you are reading, and what you are buying. This access to the personalized data then affects our daily experience in some of the most important and common areas of life. Big data is changing the way we live our lives as it is used in our everyday life such as:

- **Shopping and Marketing**- If we shop online regularly, the impacts of Big Data in our personal experience definitely include both a change in the ads we see and in our actual shopping experience. Online retailers now collect information from our activity on our computers, smart phones, and other devices that connect to the world wide web. They then analyse our data and use it to evaluate our interests and preferences and make projections about what we might buy in the future. This affects both their advertising tactics and what we see when we shop. When we make a purchase on a site like Amazon, that information is then compared to a pool of data about other consumers who purchased the same item. Those comparisons allow the retailer to make predictions about other items that might interest us. These items then will appear as suggestions in various ways as we browse the retailer's sites.
- **Travel and Transportation**- The Big Data are creating more efficient solutions to our travel and transportation needs, including the development of GPS and intelligent map programs, better sequencing of traffic signals, advancements in air travel, traffic prediction and planning, more efficient operation of mass transit systems, and on-board automobile data collection. With the help of GPS systems or smart maps programs on phones we no longer have to guess about how long our trip will take, when we will arrive, or what traffic conditions you might experience. And, of course, our own travel data is being collected to help improve the accuracy of these systems for everyone. Big Data also has revolutionized the transport industry at virtually all levels. From the moment we begin to search for a rail/bus/flight ticket, we begin a journey through multiple examples of Big Data in use. Fares are set by automated data collection and analysis, and schedules are created based on predictions made from the collection of Big Data.
- **Music, Shows, and Movies**- One of the most apparent and personal ways Big Data affects our personal life is through the entertainment and media we consume. This includes music streaming services as well as television and film platforms. Companies like Netflix, Amazon Prime, and similar others use Big Data to anticipate customer demand. Since many

of these companies are now also creating their own content, they also use the data they collect from us to determine what kind of content to produce. They build predictive models for new products and services by classifying key attributes of past and current products or services and modelling the relationship between those attributes and the commercial success of the offerings.

- **News and Information**- No matter what sources we rely on for news coverage, our experience is impacted by multiple examples of Big Data at work. From the earliest reporting and news gathering through news delivery and on to comments we might make on social media; Big Data is everywhere in the news cycle. More and more, reporters utilize social media in gathering information that shapes their news reports. Trends in Big Data populate our various media timelines with stories determined to be of higher importance or of particular interest to us. In case of internet searching, Google uses Big Data to show us suggestions in the searching options.
- **Healthcare and Medical Services**- Healthcare is another area where it is easy to trace the impacts of Big Data in our personal life. Nowadays, more and more of our medical records are being digitized. This use of electronic data can affect our life in a couple of important ways. First, it enables doctors, hospitals, and clinics to more efficiently track our history and provide the treatment we need. However, our data is also being analysed along with the health histories of many others to enable medical professionals to track diseases, determine the effectiveness of treatments, and much more. If we track our exercise or other aspects of our personal health through a wearable device like a Fitbit or through apps on our phone, our information helps professionals to track important health trends that affect research and medical progress.
- **Education and Employment**- Big Data also impacts two of the primary areas that will shape our future: education and employment processes. Many colleges and universities now rely on statistical programs designed to identify and attract students who enable the institutions to meet internal goals. Employers are also working to leverage data to improve hiring processes. They often rely on services that aggregate large volumes of data to identify candidates most likely to fit and excel in particular jobs. Some examples of Big Data in these processes include education, job history, language, public work samples, behaviour on social media.
- **Public Policy and Safety**- Police and fire departments and all levels of government are now turning to Big Data to help develop and implement new policies and procedures. Police departments and law enforcement agencies around the world increasingly work to be proactive rather than simply responding to crime after the fact. Networks of computers, cameras, and mobile devices track incidents in real-time so police can be dispatched more efficiently and effectively. Larger law enforcement efforts like campaigns to stop terrorism also rely on global collection and examination of relevant data.

As we can see that Big Data have a significant impact in our personal life. For positive impact, it makes our lifestyle smart, helps us to connect with our relatives and friends easily, and brings our everyday essentials to our doorsteps. Apart from that, by analysis of this huge data the companies and government sectors generate a gold mine with possible benefits to use. Big Data analysis helps in understanding and targeting customers. It helps in optimizing business processes. It improves healthcare and public health with the availability of records of patients. It helps to improve our knowledge. Anyone can access vast information via internet searches and get an answer to any

query. It helps to monitor and prevent crimes even before they happen. It helps in financial trading and banking. Credit card companies, banks, credit unions, and several other retailers now have the option of detecting stolen identity materials, account information, or product access to avoid losses. In short, it makes our daily life easier than before.

But there are also several negative impacts. First of all, more than half of this data is the amassment of our personal information. Large groups of information are assimilated and then analysed for insights into human behaviour, past, present, and future. A simple action, like logging into social media sites or inputting private details in banks and hospitals for compliance purposes, can leave a digital trail. Moreover, what we do not realize is that this information can be more valuable than we think. By agreeing to reveal personal data, our right to privacy and security is compromised and we become susceptible to data breaches. Incidents of people falling prey to scams that offer a huge amount of money or a stalker who gets access to an address because a profile is public, are incidents that are frequently heard of. The negative impact of Big Data has reached huge industries, like in the case of retail and banking; these industrial sectors are known to scrutinize customer behaviour and user activity to increase their market reach and acquire financial profits. Most people are unaware of the ways in which data can be misused, until they become victims of data manipulation or even worse, theft or fraud. While we may casually enter an online store to order our products or food, we have no idea that the store or company already has a fair idea about our preferences. They hold insights into our buying capacity and our market knowledge. No wonder the products we seem to fancy most but are out of our budget are always on sale. The social media apps use our personal information and our posts to make their platform more and more addictive. Many companies, such as Facebook, use Big Data to generate ad revenue by placing targeted ads to users on social media and those surfing the web. Using Big Data, it is possible to push some news to the front of both newsreaders and collectors to make it viral, which can be very harmful if is done with bad intentions. In short, data when it reaches the wrong hands, can create disaster and hack down an entire society.

In conclusion, Big Data is not bad in itself but it can have undesirable effects if the people involved in its use have malicious intentions. It is time that individuals and organizations become aware of the value of personal data and information and adopt a more transparent approach. We have to be careful before sharing our personal information on any social media. We must not share any information related to our bank details, ATM pins, OTPs with anyone else. We have to read carefully all the terms and conditions before accepting them while installing an app and allowing the app to access data saved in our smartphones. We have to be aware of the fraud emails, messages and if anything, arises suspicious it is our duty to inform it immediately to authority. We have to cross-check the genuineness of any news before sharing it with others. By such practices, we can prevent the ill use of Big Data and enjoy its marvellous facilities in our day-to-day life.

Reference:

1. I. Ahmad (Jun, 2018) 'How much data is generated every minute?' Retrieved from Social Media Today.
2. A. Kumar Roy (Apr, 2016) 'Impact of big data analytics on business, economy, health care and society' Retrieved from Journal of Biometrics and Biostatistics.
3. J. Bulao (May 18, 2021) 'How Much Data Is Created Every Day in 2021?' Retrieved from Techjury Blog
4. B. Vuleta (Jan 28, 2021) 'How Much Data Is Created Every Day?' Retrieved from Seedscientific Blog.



.....by Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)



Soumyadip Mitra, 1st Sem, Physics(H)



Suman Sadhukhan, 4th Sem, Physics(H)



Partha Biswas, 1st Sem, B.sc. Programme



A Lawyer, Tarak Biswas, 1st Sem, Physics(H)



---by Pabitra Sarkar, 4th Semester, Physics(H)

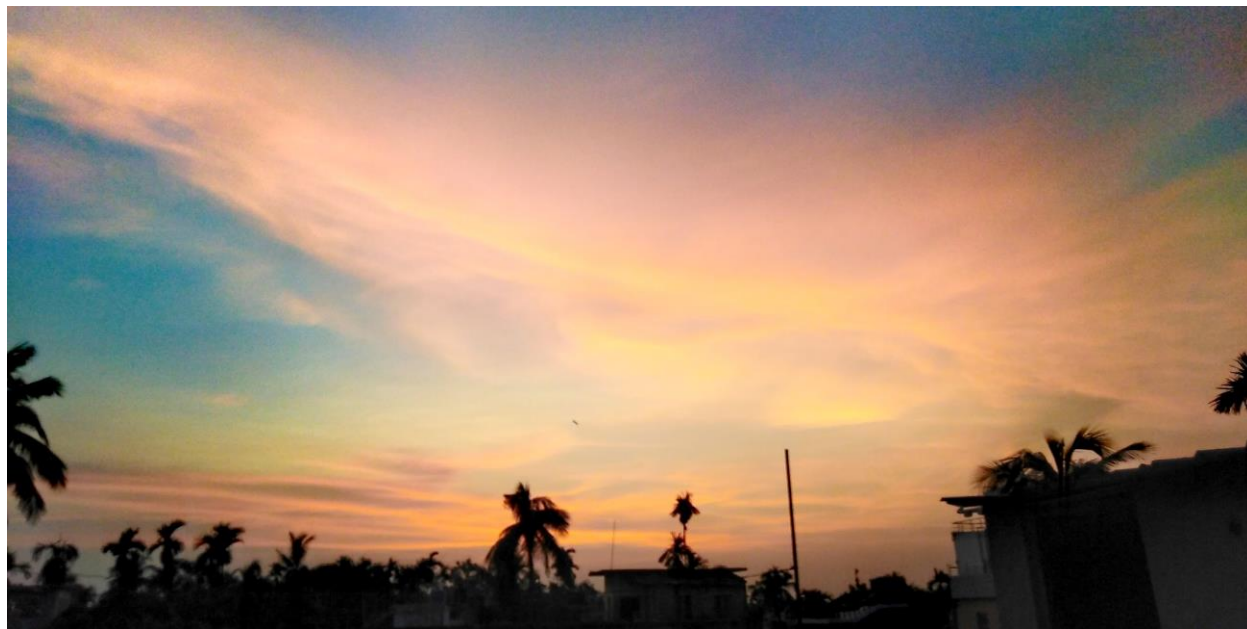


.....by Ankita Das, Faculty, Department of Physics



.....by Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics

Photography



Twilight, Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics



Ray of Peace, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics



Serenity of Golden Hour, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics



Bubbles of Joy, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics



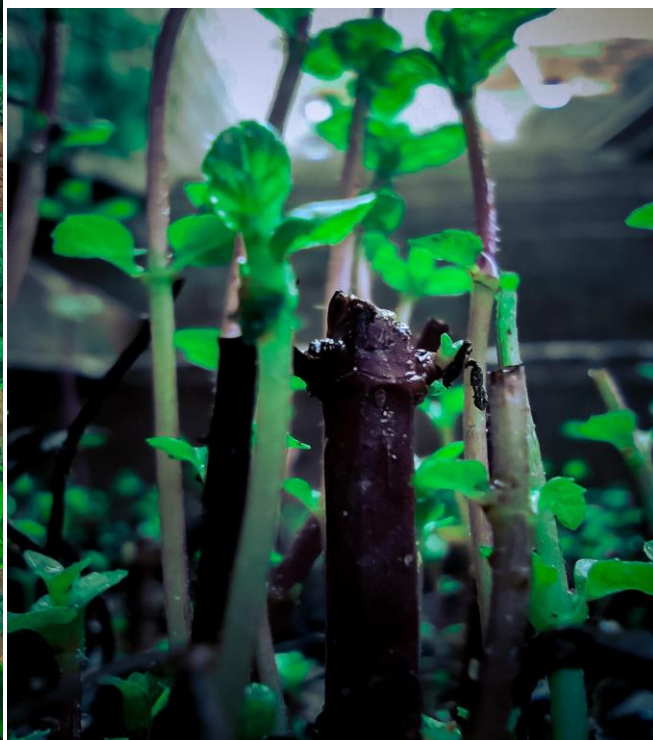
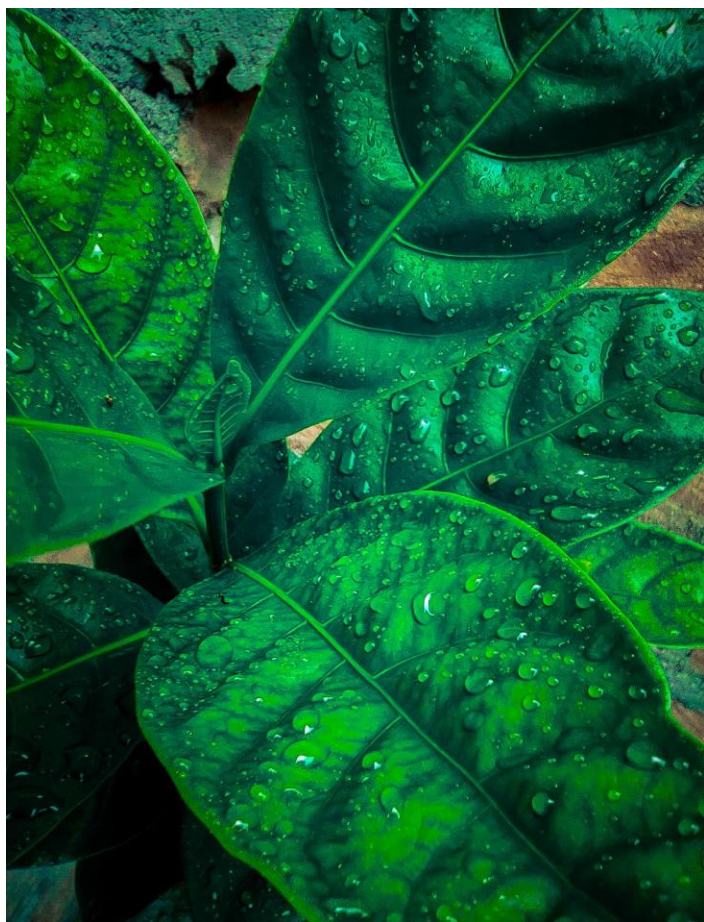
A Moment of Saffron & Gold, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics



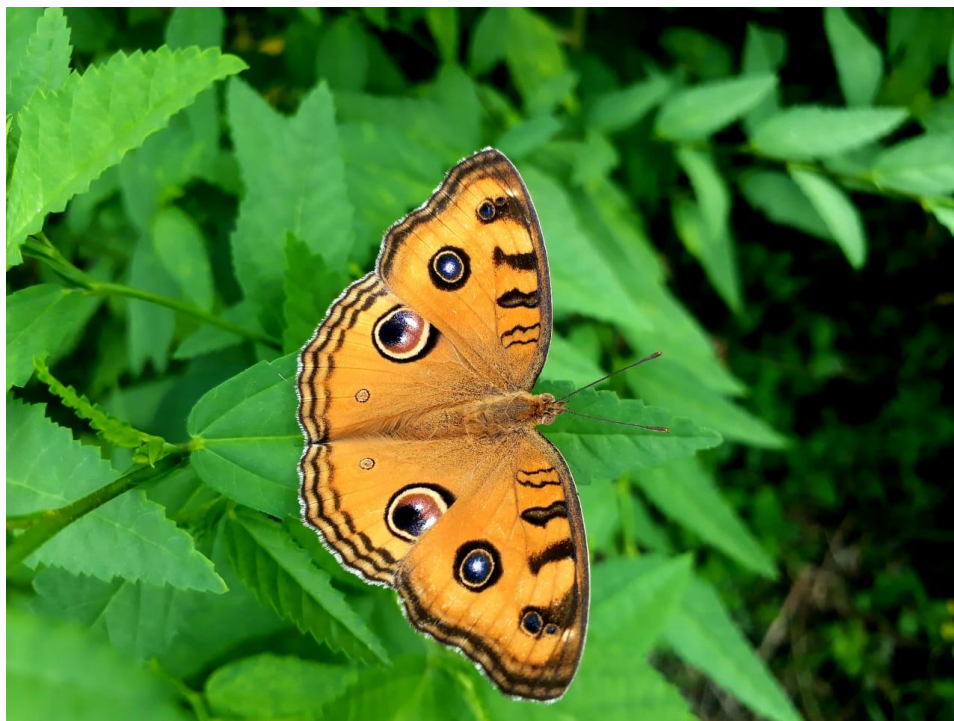
Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)



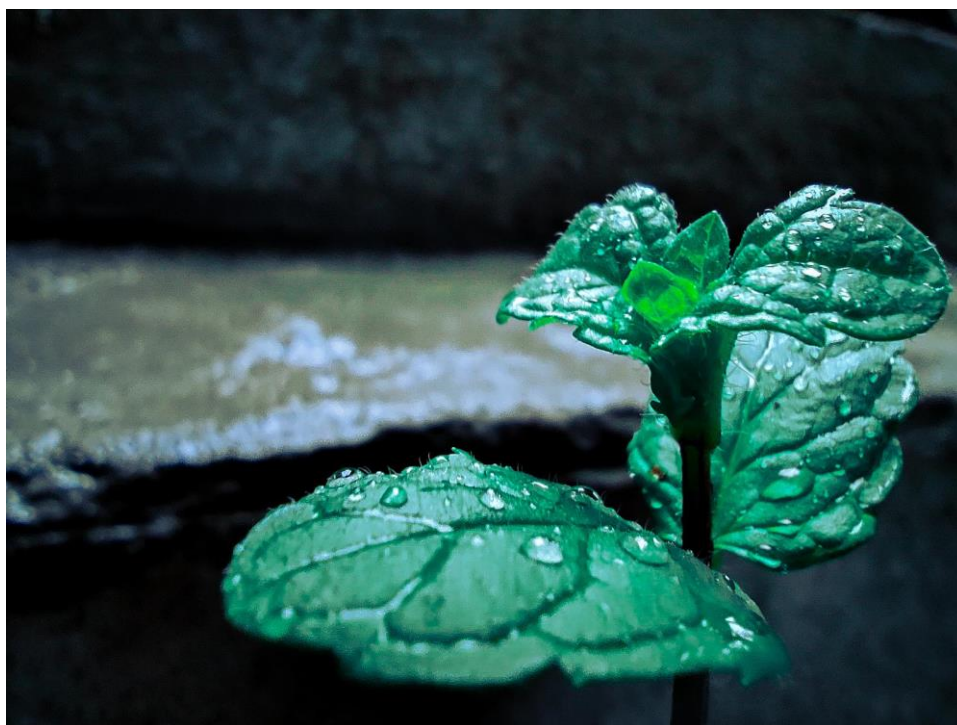
Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)



Tripanjana Ghosh, 6th Semester, B.Sc. Programme



Peacock Pancy Butterfly, Indrajeet Sikder, 4th Semester, Physics(H)



Tripanjana
Ghosh, 6th
Semester,
B.Sc.
Programme



Ankita Das, Faculty, Department of Physics



Ankita Das, Faculty, Department of Physics

Published by Department of Physics, Srikrishna College, Nadia

The Real Fighters

....Storms, Floods, Cyclones, Hunger, Child Labour, Proverty to name a few.....their fighting continues!



...at Sundarban, Dr. Sujoy Pal

Miscellaneous Activities 2020



Miscellaneous Activities 2021






শোক সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগার কর্মী
সত্যরঞ্জন কুটি (মন্টু কুটি) গত ইংরেজি ১৭.০৯.২০২০
তারিখ রাতে প্রয়াত হয়েছেন।

ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

--পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ।



A photograph of an astronaut on the lunar surface, with the Apollo 16 Lunar Module in the background. The lunar surface is covered in craters and rocks, and the sky is black. The Lunar Module has a gold-colored thermal blanket and a sign that says "UNITED STATES".

**A heart full gratitude and
acknowledgement
to the Principal, HOD,
all the Faculty member
and the contributing
students of the
Department of Physics
Srikrishna College**



A Student-Teacher Initiative
Published by Department of Physics
www.srikrishnacollegebagula.ac.in/Physics.aspx

Srikrishna College, Government Sponsored General Degree College
Affiliated to University of Kalyani, Bagula Nadia West Bengal, Pin - 741502
www.srikrishnacollegebagula.ac.in